পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

- হিন্দুধর্মের উৎপত্তি
- হিন্দুধর্মের মূলনীতিসমূহ
- স্মৃতিশাস্ত্র — প্রশ্ন ও উত্তর
- বেদ — মূল শ্লোকসমূহ
- ভগবান কৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকসমূহ
- দৈনিক মন্ত্রপাঠ— হিন্দুর অবশ্যকরণীয়
- ভজন
- স্বর্গ ও নরক
- মূর্তিপূজা
- বর্ণভেদ প্রথা
- মনুস্মৃতি
- উপনিষদ
- বিষ্ণুর দশ অবতার চক্র
- স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দর্শন
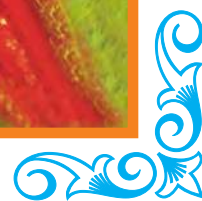
পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি ● হিন্দুধর্মের মূল নীতিসমূহ ● স্মৃতিশাস্ত্র - প্রশ্ন ও উত্তর ● বেদ - মূল শ্লোকসমূহ ● ভগবান কৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতার মূল শ্লোকসমূহ ● দৈনিক মন্ত্রপাঠ - প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যকরণীয় ● ভজন ● স্বর্গ ও নরক ● মূর্তিপূজা ● বর্ণভেদ প্রথা ● মনুস্মৃতি ● উপনিষদ ● বিষ্ণুর দশ অবতার চক্র ● স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দর্শন

হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল্ ট্রাস্ট

যিনি আমাকে জীবন সংগ্রাম করতে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তিনি সর্বদা আমার মধ্যেই নিহিত আছেন। ঈশ্বর আমাকে একাকী এই সংগ্রামে পাঠান নি।

- ।। বেদ ।।

কাপুরুষতার আশ্রয় নিও না। ওটা দুর্বলতার লক্ষন। নিজের দুর্বলতা, হৃদয় দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াও, শত্রু নিধন করো, এটাই ধর্ম।

- ।। গীতা ।।

গরু মিথ্যাভাষণ করে না, পাথর চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে না, কিন্তু গরু গরুই থেকে যায়, পাথরও পাথর থেকে যায়। কখোন কখোন মানুষ মিথ্যাভাষণও করে। কোন কোন মানুষ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, আবার এই মানুষই সৎকর্মের দ্বারা দেবতা রূপে পূজিত হন।

ভোগের অভিজ্ঞতা না হলে ত্যাগের মাহাত্ম্য বোঝা সম্ভব নয়। যার ভোগের সামর্থ আছে তার ক্ষেত্রেই ত্যাগের মাহাত্ম্য প্রযোজ্য।

- ।।উপনিষদ।।

তুমি সংসারী ব্যাক্তি। কেউ যদি তোমার গাল কামড়ে দেয় আর তুমি যদি তখন চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, এই নীতি অনুসরণ না করো, তবে তুমি অবশ্যই পাপী।

- ।। মনু সংহিতা।।

“বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা” - অর্থাৎ বীর ব্যক্তিই পৃথিবীকে ভোগ করার অধিকারী। তোমার বীরত্ব প্রদর্শন করো। প্রয়োজনে “সাম দাম দন্ড ভেদ” - এই চার নীতির প্রয়োগে সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করে যদি পৃথিবীকে ভোগ করতে পারো - তবেই তুমি ধার্মিক।

- ।।স্মৃতিশাস্ত্র।।

ইংরাজী হিরোয়িক (heroic) শব্দটির অর্থ বীর (vira) যা সততা (virtue) শব্দ থেকে উদ্ভুত। পুরাকালে যোদ্ধারাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ মানুষ হিসেবে গণ্য হতেন। বীর ব্যক্তিই সৎ মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

- ।। স্বামী বিবেকানন্দ।।

সূচিপত্র

		পাতা
১।	হিন্দুধর্মের উৎপত্তি	৫
২।	হিন্দুধর্মের মূল নীতিসমূহ	৯
৩।	স্মৃতিশাস্ত্র - প্রায়শ জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর	১১
৪।	বেদের মূল শ্লোকসমূহ	৫৭
৫।	ভগবান কৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতার মূল শ্লোকসমূহ	৮৬
৬।	দৈনিক মন্ত্রপাঠ - প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যকরণীয়	১০৭
৭।	ভজন	১১৩
৮।	স্বর্গ ও নরক	১১৪
৯।	মূর্তিপূজা	১১৫
১০।	বর্ণভেদ প্রথা	১১৯
১১।	মনুস্মৃতি	১২৬
১২।	উপনিষদ	১২৮
১৩।	বিষ্ণুর দশ অবতার চক্র	১৩০
১৪।	স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দর্শন	১৩৩
১৫।	প্রধান হিন্দু শব্দসমূহের অর্থ	১৩৭

প্রকাশকের ভূমিকা

পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ হিন্দুধর্মশাস্ত্রাদির আভাস জ্ঞাপক, বিপুল হিন্দুসাহিত্য থেকে আহৃত। হিন্দুর দৈনন্দিন প্রার্থনার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে সংকলিত পাঠ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সনাতন ধর্ম ঈশ্বরের দান, সমগ্র মানবজাতিকে প্রদত্ত, বহু সংখ্যক সত্যদ্রষ্টা (ঋষি) ও মহাজ্ঞানীর (মুনি) উচ্চারিত সত্য উন্মোচনের মাধ্যমে। অন্য সব ধর্ম যখন নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে একজন ব্যক্তির আকর্ষণীয় শক্তি এবং একটি ধর্মমতের দ্বারা, যা অন্য কোনও আধ্যাত্মিক পথ স্বীকার করে না, হিন্দুধর্ম সেখানে এক উদার ঐতিহ্যের অধিকারী। হিন্দু ধর্ম তার অনুগামীদের নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী পূজার্চনার পূর্ণ অধিকার দান করে। তথাকথিত ধর্মবিশ্বাসীদের ধর্মান্ধতা সে অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

মানবের কল্যাণের নিমিত্ত লেখক একমাত্র ঈশ্বরের নির্দেশেই চালিত। পবিত্র হিন্দুধর্মগ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনার জন্য কোনও কৃতিত্ব লেখক দাবি করেন না। হিন্দু ধর্মসংক্রান্ত মূল ও প্রামাণিক পুথি যদি কেউ দান করতে পারেন, তিনি প্রকাশকের কাছে সেটি সমর্পণ করলে পরবর্তী সংস্করণে সেটি অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হবে।

ঈশ্বর এই পুস্তকের পাঠকদের আশীর্বাদ করুন, তাঁদের ইহলোক ও পরলোক আনন্দে অভিষিক্ত ও সাফল্যমণ্ডিত হোক।

প্রফেসর ড. সত্যজিৎ
ট্রাস্টি,
হিন্দু রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটেবল্ ট্রাস্ট

হিন্দুধর্মের উৎপত্তি

হিন্দুধর্ম প্রায় ২০০০০ * বৎসর প্রাচীন একটি ধর্ম। তিন প্রধান দৈবপুরুষ, পৃথিবীতে ঈশ্বরের বাণীর প্রবক্তা ছিলেন । এরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ব্রহ্মার জন্ম মধ্যভারতে, বিষ্ণু (যাঁর অপর নাম নারায়ণ বা ভগবান বেঙ্কটেশ্বর বা ভগবান বালাজী) ছিলেন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী এবং মহেশ্বর (যাঁর অপর নাম শিব/ রুদ্র/শংকর) কাশ্মীর অর্থাৎ উত্তর ভারত থেকে এসেছিলেন।

এই ত্রয়ীর দৈব-প্রবচন এত শক্তিশালী এবং তাঁদের দান এত বিশাল যে তাঁদের ঐশ্বরিক বাণীসমূহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ এবং অন্যান্য বহু দেশকেও প্রভাবিত করেছিল। সেই প্রাচীন যুগেও, যখন যে-কোনও প্রকারের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অতি অনুন্নত, তাঁদের ঐশ্বরিক ঘোষণা দিকে দিকে বিস্তৃত হয়ে সনাতন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

এই তিন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ আদি দেবতা নামে হাজার হাজার বছর ধরে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছেন। এরাই এই সনাতন ধর্মের প্রবর্তক। পরবর্তীকালে এই ধর্মের নাম হয় হিন্দুধর্ম। এই তিন আদি দেবতার মাধ্যমে বেদ প্রকাশ হয়।

হিন্দুধর্ম কোনও একটি গ্রন্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং কোনও একটি মানুষকে এর প্রবর্তক বলে গণ্য করা হয় না। হিন্দুরা বেদকে বলেন অপৌরুষেয়ম্ । পুরুষ অর্থাৎ মানুষের রচিত নয়, বেদ ঈশ্বরপ্রেরিত মনুষ্য জীবন যাপনের মূলমন্ত্র।

সিন্ধু নদের পূর্ব তীরের সভ্যতাকে মধ্য এশিয়ার আক্রমণকারীরা হিন্দু বলত। তারা 'স'-এর উচ্চারণ করত 'হ' এবং সিন্ধু নদের পূর্ব তীরের অধিবাসীদের তারা বলত 'হিন্দু'। তারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ভারতীয়দের পদানত করে, ভারতের শাসনকর্তা হয়ে যায় এবং তাদের প্রদত্ত নামই প্রচলিত হয়ে যায় ।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের আদি নাম ছিল সনাতন ধর্ম এবং তার প্রধান দর্শন বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ বেদ প্রদত্ত ধর্ম। আক্রমণকারী এবং শাসক হিসাবে যারা ভারতে আসে তারা কালক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মিশে যায় এবং হিন্দু দর্শনের মূলতত্ত্বসমূহ গ্রহণ করে। তাদের বিদেশী পরিচয় লুপ্ত হয়ে যায়।

হিন্দুদের আরাধ্য দেবতার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর এক পরম পুরুষ, সর্বব্যাপী, অনাদি-অনন্ত। তিনি নিরাকার, বর্ণহীন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, সকল কারণের আদি কারণ। তিনি সর্বশক্তিমান, তাই তাঁর ইচ্ছাপালনের জন্য কোনও অধীনস্থ সহায়কের প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বর তাঁর মহত্ত্বের প্রতিফলন স্বরূপ দৈবপুরুষ অথবা দেবতাদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মানুষ রূপে প্রেরণ করেন। এঁদের কোনও কোনও ভারতীয় ভাষায় দেবতা বলা হয়।

ভক্তেরা ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং মন্দিরে দেবতাদের জীবন, কীর্তি ও উপদেশাদি স্মরণ করে উৎসব পালন করেন। দেবতা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। তবে তাঁরা কীভাবে প্রকাশিত হবেন সেটা নির্ভর করে দেশ-কাল ও সামাজিক পটভূমিকার ওপর।

সাধারণ মানুষেরা মন্দিরে দেবতাদের মূর্তির কাছে যান। মূর্তি শুধুমাত্র ভক্তের পূজার পাত্র নয়, ঈশ্বরের ধ্যানের জন্য মূর্তি অখণ্ড মনঃসংযোগের কেন্দ্রে পরিণত হন।

যিনি বেদ অধ্যয়ন করেছেন এবং অন্তরে তাকে সত্যরূপে উপলব্ধি করেছেন, অর্থাৎ ধর্ম-দর্শনের গূঢ় তাৎপর্য যিনি অবগত হয়েছেন, মূর্তিপূজা তাঁর কাছে অনাবশ্যক। তিনি ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হয়েছেন।

মনে রাখতে হবে একমাত্র ঈশ্বরই উপাস্য। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান এবং পৃথিবী ও সৌরলোকের সীমার অতীত। তাঁর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সকল মানুষ আসেন পূজার্চনা নিয়ে। যে নামেই পূজা হোক বা যে ভাবেই অর্চনা করা হোক, ঈশ্বর তা গ্রহণ করেন।

সনাতন ধর্মের ইতিহাসের আদিপর্বে হিন্দুরা একেশ্বরবাদী ছিলেন, এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা মূর্তিপূজা শেখেন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর চাকচিক্যময় নাগরিক সভ্যতা থেকে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার অধিবাসীরা সূর্যদেবতার, ভগবান শিবলিঙ্গের, মাতৃমূর্তির এবং কয়েকটি পশুপ্রতীকের পূজা করতেন।

মূর্তিপূজা মেসোপটেমিয় (মিশর) এবং সুমেরীয় (পারস্য) সভ্যতার প্রভাবের ফল। সে যুগে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে 'কিউনিফর্ম' লিপি ব্যবহার করা হত। কিউনিফর্মে অনেক মূর্তি চিহ্ন ব্যবহার হত। হরপ্পা ও

মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার চরম উন্নতি ঘটেছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৪৩০-এর পূর্বে। হিন্দু পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী ৩৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমুদ্রতলে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। তার ফলে বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়, যার দ্বারা সিন্ধুর তটভাগ প্লাবিত হয়। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থান কর্দমে আবৃত হয়। প্রায় নিমেষের মধ্যে মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং জল অপসৃত হওয়ার পরে এই সব সভ্যতা কর্দমের স্থূল আস্তরণের নীচে সমাধিস্থ হয়ে যায়।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারের নাগরিক সভ্যতায় গৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্যে প্রচুর কাঠের ব্যবহার হত। তার ফলে অরণ্যগুলি প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অরণ্যের ধ্বংস প্রকৃতির অভিশাপ স্বরূপ হয়ে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর বিলোপ ত্বরান্বিত করেছিল।

মূর্তিপূজা প্রকৃতপক্ষে দেবতার পূজা অর্থাৎ বীরপূজা। দেবতারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং সেই কারণে, এক অঞ্চলের দেবতা কখনও কখনও অন্য অঞ্চলে পূজিত হন না। তবে, যে-ভাবেই হোক, এবং যে নামেই পূজা হোক, যে মাধ্যমেই শ্রদ্ধা নিবেদিত হোক, ঈশ্বর সে-পূজা গ্রহণ করেন।

বেদের যুগে বর্ণভেদ ব্যবস্থা, শিশুবিবাহ কিংবা সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল না, যদিও শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সদস্য কেউ গুরু, কেউ শিক্ষক, কেউ যোদ্ধা অথবা কেউ কারিগর বৃত্তি অবলম্বন করতে পারতেন। বিভিন্ন বৃত্তির এবং পেশার মানুষের মধ্যে বিবাহ এবং এক বৃত্তি থেকে আরেক বৃত্তিতে প্রবেশ সাধারণ ঘটনা ছিল।

নারীও পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে বেদচর্চা করতেন। অপালা, ঘোষা, বিশ্ববরা, লোপামুদ্রা, বিশাখা প্রভৃতি নারীরা বৈদিকযুগের আদি পর্বে বৈদিক শাস্ত্রে বিদুষী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর স্বামী নির্বাচনের এবং মতামত প্রকাশের অধিকার ছিল। শস্ত্র বিদ্যাতেও নারীরা পারদর্শিতা লাভ করতেন, যুদ্ধেও যোগদান করতেন। উদাহরণস্বরূপ, বৈদিক কালের এক যুদ্ধে একজন খ্যাতনাম্নী নারী সেনাপ্রধান ছিলেন মুদ্‌গলনি। নারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গিনী হতেন।

মূলতঃ হিন্দুরা একেশ্বরবাদী এবং এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী। দক্ষিণ ভারতে ঈশ্বর দেবতি/ দেবাড়ু/ঈশ্বরণ/কাডাভু/ ইরাইবন, এইসব নামেও অভিহিত। দেবতাদের অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট মানবকুলকে বীর ও বীরাঙ্গনা হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয় এবং হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে তাঁরা ঈশ্বরপ্রদত্ত বিশিষ্ট কোনও কোনও গুণের অধিকারী।

** প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও লেখক কালকূট তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'পৃথা'-তে (প্রকাশক, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯) ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ঐতিহাসিক গণনায় যখন কলিযুগ ৩১৭৯ বৎসর প্রাচীন ছিল, তখন ভারতীয় শকাব্দ অর্থাৎ কণিষ্কের কাল থেকে বর্ষগণনা আরম্ভ হয়। ২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯২৭ শকাব্দ। অতএব আজকের এই সময়ে কলিযুগের বয়স আনুমানিক ৫১০৬ (৩১৭৯ + ১৯২৭ বর্ষ) অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বৎসর। আমরা জানি সত্যযুগ আরম্ভ হয় যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রকট হন এবং সনাতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। মানুষের বিবর্তনে চক্রাকারে আবর্তিত হয় চারটি যুগ --- সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলিযুগ। প্রত্যেকটির স্থিতি ৫০০০ বৎসর বা তৎঅধিক অতএব সনাতন ধর্মের বয়স আনুমানিক অন্তত ২০,০০০ বৎসর।*

হিন্দুধর্মের মৌলিক নীতি

১। সাধারণ জ্ঞান আহরণ করো, অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকা পাপ। ব্যক্তির অধিকার মূলত তার নিজস্ব কর্তব্য (আসক্তি ও আশঙ্কা ত্যাগ করে) যথাসাধ্য উত্তমরূপে পালনের চেষ্টা করা। অবস্থা অনুযায়ী ফললাভ অবশ্যই হবে।

২। দান দয়ার প্রকাশ। লাভের প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত পাত্রকে দান করা দয়ার প্রকাশ এবং এই রকম দান ঈশ্বরকে প্রীত করে।

৩। দেহ একটি নৌকাস্বরূপ, যার প্রথম এবং প্রধান কাজ জীবন সমুদ্রের অপর তীরে অমরত্বের উপকূলে পৌঁছে দেওয়া।

৪। ঈশ্বরকে হৃদয়, আত্মা ও সর্বশক্তি দিয়ে ভালোবাসতে হবে। যে-কেউ ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে নীতিজ্ঞান বর্জিত মানুষ। সে একাধারে মানুষ ও মানবতার শত্রু।

৫। হত্যা, ব্যাভিচার, চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, অপরের সম্পত্তিতে লোভ ঈশ্বরকে ক্রুদ্ধ করে। সৎভাবে জীবনযাপন, অমায়িক ব্যবহার এবং নিজ পরিশ্রমে জীবন ধারণ কর্তব্য।

৬। যে অপরের অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে, ঈশ্বর তার কৃত অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করেন।

৭। বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্ত্রের মতো শাণিত করতে হবে, যেন সেটি দুঃখের কারণকে বিদ্ধ করে বিনাশ করতে পারে।

৮। প্রার্থনা করার জন্যে মন্ত্র অথবা শ্লোক না জানলেও চলবে। ধ্যান করতে জানারও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের অভিমুখে হৃদয়কে উন্মুক্ত করে সৎ জীবন যাপন করলেই ঈশ্বর সবচেয়ে প্রীত হন। তারজন্যে কোনও পুরোহিতের প্রয়োজন নেই।

৯। আত্মা অমর, জীবন-মৃত্যু চক্রবৎ আবর্তিত। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হয়, আত্মা অবিচল থাকে। আত্মা তরবারির দ্বারা ছিন্ন হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। তাই সৎ কর্মে সকলকে হতে হবে অসীম সাহসী।

১০। জীবন মঙ্গল ও অমঙ্গলের অন্তহীন সংগ্রাম। বচনে ও কর্মে অতি সতর্কতা প্রয়োজন, যেন ভালো মানুষ আঘাত না পায় ।

১১। ক্রোধ, ঈর্ষা, আতঙ্ক এবং শোকের মতো মারাত্মক অনুভূতির কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। ঈশ্বরের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বদা আশা রাখতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে যে শেষপর্যন্ত সমস্ত কিছুর ফল শুভই হবে।

১২। মানুষ পৃথিবীতে আসে নগ্ন হয়ে, বিদায় নেয় একই অবস্থায়। স্বল্প আয়ুষ্কালে মানুষকে চেষ্টা করতে হবে তার পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর উন্নতি করতে, যাতে সে যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে তখন সে তার পারিপার্শ্বিক পৃথিবীকে যে-অবস্থায় পেয়েছিল তার চেয়ে ভালো অবস্থায় রেখে যেতে পারে।

১৩। বিশ্ব সংসারে সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি, ঈশ্বরের দানসমূহ ঠিক ঠিক ব্যবহার করার দায়িত্ব ও অধিকার সকলের সমান।

১৪। দশ বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক প্রত্যেকের কর্তব্য দিনে অন্তত দুবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা (প্রাতঃকালে সারা দিনের কর্মপরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে মন্ত্র উচ্চারণ ও প্রার্থনা এবং সন্ধ্যায় অর্জিত সাফল্যের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং যা-কিছু বিফল হয়েছে তার আত্মসমীক্ষা করে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে)। সপ্তাহে অন্তত একদিন প্রত্যেকের উচিত কোনো সাধারণ উপাসনা স্থলে, যেমন মন্দিরে গিয়ে সমাজের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে প্রার্থনা করা। পুরোহিত সে প্রার্থনা পরিচালনা করবেন এবং গীতা, বেদ ইত্যাদি থেকে অন্তত পাঁচটি শ্লোকের তাৎপর্য আলোচনা করবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন, যাতে সে-সবের অন্তর্নিহিত অর্থ আজকের মানুষকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে তা উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেককে দিনে অন্তত দশ মিনিট প্রাণায়াম করতে হবে এবং মাসে একবার ‘ভোজ উৎসব’* এর আয়োজন বা অন্যের আয়োজিত উৎসবে যোগ দিতে হবে।

* *ভোজ উৎসব -- পূর্ণিমার দিন মধ্যাহ্নে উপোস থেকে সন্ধ্যায় পূর্ণিমার আলোকে, সমাজের লোকদের নিয়ে খাওয়া দাওয়া এবং আনন্দ উৎসব করা। নিজে ভোজ উৎসব আয়োজন অথবা অন্যের আয়োজিত ভোজ উৎসবে যোগদানে একই পুণ্য লাভ হয়।*

স্মৃতিশাস্ত্র

(প্রায়শ জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর)

স্মৃতিশাস্ত্র দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সংকলন। এতে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রের এবং ঋষিদের বাক্য স্মৃতি থেকে সংকলিত। স্মৃতিশাস্ত্রের একাধিক ভাষ্য প্রচলিত আছে।

প্রশ্ন - ১ ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রমাণ কীসে পাওয়া যায়?

উত্তর : প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীর দৈনন্দিন জীবনেই সাহসের পরিচয় থাকবে, সাহস কারও জীবনে প্রয়োজনের মুহূর্তে কিংবা বিপদের সময়ে হঠাৎ উপস্থিত হয় না। কাউকে সাহস শিক্ষা দেওয়া যায় না। জীবন সংগ্রামে সাহসের পরিচয় দেওয়া একটা অভ্যাস। সাহস চরিত্রের একটা প্রধান অঙ্গ। প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে সাহস গড়ে ওঠে। ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসী জানেন, ঐশী শক্তির বিরুদ্ধে কিছুই দাঁড়াতে পারে না এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীর পক্ষে শেষ পর্যন্ত সব কিছুরই ফল শুভ হবে। একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি ভয়কে জয় করেন এবং সাহসের সঙ্গে কাজ করেন।

প্রশ্ন - ২ ভগবান কী?

উত্তর : ভগবানই ঈশ্বর। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর প্রতীক 'ওঁ'। ঈশ্বর অবিভাজ্য, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছু করতে পারেন। তিনি একমেবদ্বিতীয়ম। তিনি সকল কারণের কারণ। যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, নিজের ইচ্ছা পূরণের জন্য তাঁর কোনো সঙ্গীর বা সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি প্রথম থেকে আছেন, তাঁর অন্ত নেই। জন্মগ্রহণের জন্য তাঁর পিতা মাতার প্রয়োজন হয়নি, তাই পিতা মাতার কাছ থেকে তিনি তাঁর নাম পাননি। তাঁকে নাম দিয়েছেন মানুষ ভক্তেরা। অতএব ভগবান অর্থাৎ ঈশ্বরের নামের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তাঁকে যে নামে ডাকা যায় তিনি সেই নামেই ভক্তের প্রার্থনা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন - ৩ ঈশ্বর এবং দেবতার মধ্যে পার্থক্য কী ?

উত্তর : ঈশ্বর এক এবং অবিভাজ্য, সর্বশক্তিমান, সকল কারণের কারণ। দেবতারা মূলত মানুষ। পৃথিবীতে দেবতারা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি। ঈশ্বর তাঁর প্রেম ও করুণার বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতিভূদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। দেবতারা, শিক্ষক এবং পরিত্রাতা রূপে নিজেদের দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষের মনের অন্ধকার দূর করেন, মানুষকে পথ দেখান যাতে বসবাসের জন্য পৃথিবী আরও ভালো ও নিরাপদ স্থান হয়। ঈশ্বরের মহিমা তাঁদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। দেবতার অনুগতরা আসলে ঈশ্বরের অনুগত। মনুষ্যরূপী দেবতাদের মধ্যে তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিভূকে দেখেন। ভক্তরা তাঁদের কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা নানা রূপে বর্ষণ করেন। কেউ দেবতার আদলে প্রতিমা নির্মাণ করেন, কেউ নামকীর্তন করেন, কেউ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় লোকসঙ্গীত রচনা করেন। বিশ্বাস করা হয়, দেবতারা ঈশ্বরের দূত, ঈশ্বর তাদের ভালোবেসে নির্বাচিত করেছেন। কথিত আছে মৃত্যুর পরেও দেবতারা ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেন।

প্রশ্ন - ৪ ঈশ্বর যদি পরমাত্মা হন, তাহলে দেবতাদের পূজা কি তাঁর অপমান নয়?

উত্তর : গীতা বলেছেন ঈশ্বর পরমাত্মা, সর্বশক্তিমান এবং তিনি এত মহান যে ভক্ত তাঁর জায়গায় তাঁর দূতদের অর্থাৎ দেবতাদের পূজা করলেও তাঁর অপমানবোধ মনে হয় না।*

তবে ঈশ্বরের আরাধনা করলেই শ্রেষ্ঠ ফললাভ হয়। নিয়মিত প্রভাতে ও সায়ংকালে সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে। মন্ত্রোচ্চারণের জন্য দিনে দশ মিনিট প্রয়োজন, কিন্তু সারাজীবন মানুষকে তা রক্ষা করে এবং ইহজীবনের পরে স্বর্গবাসের পাথেয় হিসেবে কাজ করে।

** একটি দৃষ্টান্ত : একজন বিশাল সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁকে অথবা তাঁর অধীনস্থ ব্যক্তিদের কে কখন একটি ক্ষুদ্র সম্মান প্রদর্শন করল তা নিয়ে কখনোই মাথা ঘামান না। আর ঈশ্বর তো যে কোনো অমিত শক্তিশালী ব্যক্তির তুলনায় অনন্তগুণ বড়, তার কাছে একজন মানুষ তো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর চেয়েও অনেক সামান্য। সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের ব্যবহারে তিনি অপমানিত বোধ করবেন কেন?*

প্রশ্ন - ৫ স্বার্থপর পৃথিবী যখন আমাদের বিষণ্ণতার কারণ হয় তখন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতা লাভের কী উপায়?

উত্তর : সংসারে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিকতা ও কর্মের পারস্পরিক সহযোগিতা। আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ ধর্মপালন এবং কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা ঈশ্বরের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করতে হবে। সেই মন্দিরে তাঁর স্ব-মহিমায় ঈশ্বর অধিষ্ঠিত থাকবেন। ঈশ্বর প্রত্যেককে ইন্দ্রিয়, চেতনা, শক্তি, স্নায়ুতন্ত্র, পেশী, আবেগ ও সর্বোপরি বিচারবুদ্ধির অনুভূতি দিয়েছেন। ঈশ্বরের একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল মানুষের কর্মের দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দরভাবে বাসযোগ্য করে তোলা। বিষণ্ণতার কারণে কেউ যদি দৈনন্দিন কর্ম ও প্রচেষ্টা থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে নেয় তবে সে কাজ হবে এক চূড়ান্ত স্বার্থপরতা। তার ফলে তাকে ঈশ্বরের প্রেম হারাতে হবে। শূন্যতাবোধ থেকে শান্তি পাওয়া যায় কিন্তুপূর্ণতা প্রাপ্তি হয় শুধুমাত্র ঈশ্বরের ধ্যানে। ঈশ্বরের কোনও নির্দিষ্ট প্রতিমা অথবা মূর্তি নেই।

প্রশ্ন - ৬ কালের প্রারম্ভে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল?

উত্তর : কালের প্রারম্ভে অন্ধকারের ভিতর অন্ধকার প্রচ্ছন্ন ছিল। সবকিছুই ছিল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কোন কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, শুধু ছিল এক ও অসীম শূন্যতা। যিনি সেই মহাশূন্যতায় আবৃত ছিলেন, তিনি প্রকট হলেন। তিনিই হলেন ঈশ্বর, তাঁরই কৃপায় সৃষ্ট হল যা কিছু স্থাবর এবং জঙ্গম, যা কিছু পায়ে চলে, সাঁতার দেয়, আকাশে ওড়ে --- এই বিচিত্র সৃষ্টি। এই অন্তস্থিত সত্যই ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশ।

প্রশ্ন - ৭ ঈশ্বরের প্রকৃত নাম কী? তাঁর সৃষ্টির মঙ্গলার্থে তিনি কী শিক্ষা দেন?

উত্তর : রহস্যের অন্তরালে আবৃত যে সত্য, সেখানে বিশ্ব একটি নীড়ে অধিষ্ঠিত। সেখানেই সব একত্রিত, সেখান থেকেই সব কিছু উৎসারিত। একমাত্র ঈশ্বরের কোনও নাম নেই, ভক্তরা তাঁকে যে নামে ডাকে তিনি সে নামেই ভক্তের ভক্তি গ্রহণ করেন। তাঁর মহিমার প্রতিফলন স্বরূপ, তাঁর সৃষ্টির

মঙ্গলার্থে তাঁর দূতরা মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আগমন করেন। তাঁরা দেবতা নামে পরিচিত। পুণ্যবান ব্যক্তিরা ঈশ্বরের আরাধনা করেন অন্তরে এবং দেবতাদের জীবন, কীর্তি ও শিক্ষাসমূহ নিয়ে উৎসব করেন মন্দিরে।

প্রশ্ন - ৮ হিন্দু বিবাহের প্রকৃত পদ্ধতি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : প্রকৃত হিন্দু বিবাহ হবে নারী ও পুরুষের মধ্যে দেশের আইন অনুযায়ী সিদ্ধ, স্থানীয় আচার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত।

প্রশ্ন - ৯ প্রতিদিন কি মন্দিরে যাওয়া প্রয়োজন? পুরোহিতের কর্তব্য কী?

উত্তর : প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে সমস্বরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা মানসিক শক্তি দান করে এবং তার ফলে দৈব সুরক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু এটি কর্মনাশা। তাই আবশ্যক নয়। সপ্তাহে অন্তত একবার মন্দিরে গিয়ে সমবেত প্রার্থনাতে যোগ দিলেই ঈশ্বরের বহু কৃপায় জাগতিক সমস্যার সমাধান হয়।

পুরোহিত সমবেত ভক্তদের সঙ্গে সমস্বরে প্রার্থনা পরিচালনা করবেন এবং বেদ/উপনিষদ/গীতা প্রভৃতি থেকে অন্তত পাঁচটি শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন, যাতে ভক্তদের আজকের সমস্যার সমাধানে ওই সব শ্লোক পথপ্রদর্শনের কাজ করে। পুরোহিতের উচিত হিন্দুসমাজের বন্ধু, দার্শনিক ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় কাজ করা এবং সমাজের নৈতিক, বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের, শিক্ষার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা। পুরোহিত এবং তার পরিবারের স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য ভক্তদের মন্দিরের মাধ্যমে প্রভূত অর্থ সাহায্য দিতে হবে। এই সাহায্য ভক্তের আয়ের নূন্যতম এক শতাংশ হওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন - ১০ আমাদের কি দেবতার পূজা করা এবং পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য ?

উত্তর : দেবতাকে পূজা দেওয়া অপেক্ষা প্রার্থনা অধিকতর ফলদায়ী। পূজা দেওয়া

অবশ্য কর্তব্য নয়। পুরোহিতের আর্থিক প্রয়োজনসমূহ উপলব্ধি করা, এবং নিজ আয়ের এক শতাংশ মন্দির এবং ধর্মমূলক সংস্থাকে প্রদান করা উচিত, যাতে উচ্চশিক্ষিত এবং সক্ষম ব্যক্তিরা পুরোহিতের বৃত্তিতে যোগদান করতে উৎসাহিত বোধ করেন। পুরোহিতের সচ্ছল জীবন যাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। উত্তম পুরোহিত সমাজ সেবক ও সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা নিলে সমাজের উৎকর্ষ লাভ হয়। পুরোহিতকে দেওয়া অর্থ হাজারগুণে ঈশ্বর ভক্তকে ফিরিয়ে দেন।

প্রশ্ন - ১১ হিন্দুর সৎকার কী রকম হওয়া উচিত?

উত্তর : অগ্নিকে পরমাত্মার একটি রূপ বলে বিবেচনা করা হয়। অতএব দেহ অগ্নিতে প্রজ্বলিত করা উচিত, যাতে আত্মা এবং পরমাত্মার মিলন হয়। তবে এ বিষয়ে দেশের আইন মান্য করা কর্তব্য।

প্রশ্ন - ১২ স্ত্রীর প্রতি স্বামী এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের অভাবের শাস্তি কী হওয়া উচিত? ব্যাভিচারের শাস্তি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : বিবাহিত দম্পতির পরস্পরের প্রতি আনুগত্য থেকে চ্যুতি বিশ্বাসভঙ্গের সামিল। বিশ্বাসভঙ্গ অনেক প্রকারের হতে পারে, যথা, নিয়োগকর্তা - নিযুক্ত ব্যক্তি, করদাতা - কর সংগ্রাহক, সরকারী কর্মচারী - জনসাধারণ প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাসভঙ্গের যা শাস্তি, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। আইন সকল ক্ষেত্রে একই ভাবে ক্রিয়াশীল ।

ব্যাভিচারের অর্থ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে একে অপরকে বঞ্চনা করা। শাস্তি হওয়া উচিত সেই অনুপাতে।

প্রশ্ন - ১৩ বলাৎকার ঘটলে তার কী শাস্তি?

উত্তর : বলাৎকার চূড়ান্ত হিংসা, শাস্তি সেই অনুপাতে হওয়া উচিত।

প্রশ্ন - ১৪ কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে গমনের যোগ্য?

উত্তর : যিনি জীবিকা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, অন্যদের জীবিকা অর্জনে সাহায্য করেন, লোভী নন, ভক্তি ও বিচারবুদ্ধি সহযোগে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং নিজের জীবনে শাস্ত্র নির্দেশিত নীতির প্রয়োগ করেন, তেমন ব্যক্তিই স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত।

প্রশ্ন - ১৫ যে ব্যক্তি জনসাধারণের জন্য মন্দির নির্মাণ ও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, স্বর্গে তাঁর প্রতি কী রকম ব্যবহার করা হয় ?

উত্তর : যিনি সাধারণ লোকেদের জন্য মন্দির নির্মাণ করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ অথবা শক্তি ব্যয় করেন, ঈশ্বর তাঁর জন্য একটি গৃহ স্বর্গে তৈরি করে রেখে দেন।

প্রশ্ন - ১৬ জগতে ঈশ্বর ও শয়তানের কী স্থান?

উত্তর : ঈশ্বর আনন্দ, শয়তান দুঃখ। ঈশ্বরের অনুগামীরা সুখী জীবনযাপন করেন, অন্যদের আনন্দ বিধান করেন, অনন্ত স্বর্গলাভ করেন। শয়তানের অনুগামীরা হিংসাপূর্ণ, গুপ্ত এবং কুৎসিত জীবন যাপন করে, তাদের সংস্পর্শে যে আসে তার জীবন যন্ত্রণাবিদ্ধ হয় এবং তারা নরকে গমন করে। শয়তানের অনুগামীরা জীবনধারণ করে নিয়ত লুঠ করে, ঈশ্বরের অনুগামীরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন এবং ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবা করেন।

শয়তান মানুষের কল্পনা এবং মনুষ্য সৃষ্ট অপরাধী। শয়তানকে যারা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন, তারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপমান করেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছার অবাধ্য কিছুই নয়, সে ক্ষেত্রে শয়তানকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা মূর্খতা এবং ঈশ্বরকে অপমান করা।

প্রশ্ন - ১৭ পুরোহিত হওয়ার জন্য একজনের কি ব্রহ্মচারী হওয়া প্রয়োজন?

উত্তর : পুরোহিতকে উত্তমরূপে শিক্ষিত হতে হবে, আলোকপ্রাপ্ত হতে হবে, স্বার্থশূন্য, সদর্থক মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে, ভক্তদের সমস্যার কথা ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। আর্তপীড়িতদের সমস্যা সমাধান করবার এবং তাদের স্বস্তি দানের জন্য যথেষ্ট বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও সমাজের ওপর প্রভাব থাকা দরকার। ব্রহ্মচর্য পৌরোহিত্যের জন্য কোনো বিশেষ আবশ্যিক গুণ নয়। স্তোত্রগীতের উপযোগী সুমধুর কণ্ঠস্বর একটি প্রয়োজনীয় গুণ।

ব্রহ্মচর্য শুধুমাত্র জীবন সম্পর্কে একটি মনোভাব, আর কিছু নয়। মন্দিরের প্রধান বা পুরোহিতের কর্ম করার জন্য ব্রহ্মচারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। ব্রহ্মচর্য রক্ষার্থে মানুষকে যে মানসিক ও শারীরিক চাপ সহ্য করতে হয়, তা মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে শ্রান্ত, বিভ্রান্ত এবং বিপথগামী করে তুলতে পারে।

প্রশ্ন - ১৮ শাস্ত্র এবং ধর্মপুস্তক পাঠের কী প্রয়োজন?

উত্তর : সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় প্রণীত। শাস্ত্রপাঠ জীবনের ধ্রুবতারা খুজতে সাহায্য করে, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে রক্ষা করে এবং পরলোকের পাথেয়র কাজ করে।

প্রশ্ন - ১৯ ঈশ্বর মানুষকে দুঃখ, বিপদ কেন দেন?

উত্তর : ঈশ্বর মানুষকে তার হাত-পা দিয়েছেন, বুদ্ধি-বিবেক দিয়েছেন। দুঃখ-বিপদে পড়ে কোনও কোনও লোক ভেঙে পড়ে, ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায়। দুঃখ-বিপদের সময়েই ঈশ্বর বিশ্বাসের পরীক্ষা হয়। বেশির ভাগ দুঃখ-বিপদের কারণ মানুষের নিজের মনোভাব সংক্রান্ত আচরণ, সামাজিক পরিস্থিতি, নিজের অজ্ঞতা ও কর্মফল। দুঃখ বিপদের সময় ঈশ্বর বিশ্বাসে আরও একমুখী হতে হবে এবং জীবনকে আরও কর্মময় করে তুলতে হবে।

প্রশ্ন - ২০ দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ যেখানে বেশি সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করে, ঈশ্বর মানুষকে সৎ হতে কেন আদেশ দেন?

উত্তর : দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন এবং দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করে, সৎ মানুষ স্বচ্ছন্দ নিদ্রা উপভোগ করেন। সৎ মানুষ, চরিত্রবান মানুষ সুখে থাকেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি ভাগ্যবান ও পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির স্থান হয় নরকে।

প্রশ্ন - ২১ যাঁরা মহৎ কীর্তি স্থাপনের চেষ্টা করছেন, তাঁরা কী রকম আচরণ করবেন?

উত্তর : স্বার্থপর, ঈর্ষাকাতর, অকর্মণ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে মহৎ কাজে অনেক বাধা আসে। লক্ষ্য অবিচল রেখে কীর্তিমান মানুষকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, "আমি এমন কিছু যেন না বলি এবং না করি যাতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।" কোনো রকম কলহে লিপ্ত হওয়া চলবে না। কলহ প্রবণতা ঈশ্বরের কাছে প্রীতিপদ নয়।

প্রশ্ন - ২২ সমাজে এবং পরিবারে নারীর স্থান কী হওয়া উচিত?

উত্তর : উড়বার জন্য পাখির দুটি ডানাতেই সমান শক্তি প্রয়োজন, তেমনি সকল সুখের ও পারিবারিক উন্নতির জন্য সমাজে, সংসারে ও আইনের চোখে নারী এবং পুরুষের স্থান ও প্রভাব একই মাপের হতে হবে। নারী পুরুষের প্রভাব যে সংসারে সমান নয়, ঈশ্বর সেই সংসারে সুখ দেন না।

প্রশ্ন - ২৩ সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থাৎ সংসার ত্যাগ কি ঈশ্বরকে প্রীত করে?

উত্তর : সন্ন্যাসের অর্থ নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জাগতিক ব্যাপারসমূহের সংস্রব ত্যাগ। এটা জাগতিক চাহিদার প্রতি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা নিজ স্বার্থপরতারই চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রত্যেক মানবসমাজের মধ্যেই অবশ্য কিছু কিছু অনন্য ব্যবস্থা নিহিত থাকে, যার ফলে কেউ একান্তভাবে স্বার্থপর হতে পারে না। এই ব্যবস্থার কারণেই

নিহিত স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টার অঙ্গস্বরূপ মানুষের মধ্যে অন্যের মঙ্গল সম্পর্কেও আগ্রহ জন্মায়। বস্তুত অন্যের স্বার্থ সম্পর্কে যত্নবান না হলে নিজের স্বার্থও রক্ষা করা যায় না। সামূহিক স্বার্থই মানুষকে সর্বদা নিজের স্বার্থ এবং অপরের স্বার্থ রক্ষা করার পথ দেখায়।

এমনকি সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থও ধীরে ধীরে সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ , প্রতিবেশীদের স্বার্থ, দেশের স্বার্থ এবং সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থের সঙ্গে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যায়। পৃথিবীতে কর্মই একমাত্র পূজা, যাতে ঈশ্বর প্রীত হন। সন্ন্যাস স্বার্থপর পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয়। আমাদের প্রিয় দেবদেবীরা কেউই সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকে সংসার ধর্ম পালন করেই মানব কল্যাণ করেছেন।

প্রশ্ন - ২৪ ব্রহ্মচর্য কী?

উত্তর : ব্রহ্মচর্যের অর্থ আত্মসংযম এবং লক্ষ্যের উপর একাগ্রতা। ব্রহ্মচর্য শুধু কাম প্রবৃত্তির সংযম নয়। কাম প্রবৃত্তি ঈশ্বরের একটি দান এবং সীমা অতিক্রম না করে সমাজের নিয়মমত এর ব্যবহার স্বর্গসুখের অনুভূতি দেয়। গীতায় এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে।

প্রশ্ন - ২৫ ব্রহ্মচর্য আমাদের কেন প্রয়োজন? কার প্রয়োজন?

উত্তর : যে ব্যক্তি একাগ্রতার শপথ গ্রহণ করেন, জীবনের সমস্ত পার্থিব প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন বলে ঠিক করেন তাঁকে তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চাহিদা এবং বিবিধ দৈনিক প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। ব্রহ্মচর্য পার্থিব সুখভোগ এবং ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনসমূহকে বর্জন করার অঙ্গ। ছাত্রাবস্থায় অধ্যয়নে একাগ্র হওয়া দরকার। ব্রহ্মচর্য একাগ্রতায় সাহায্য করে। তাই ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালন করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন - ২৬ পরিবারকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ কি আমাদের কর্তব্য?

উত্তর : আত্মার সুখের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে নিষ্ঠাসহকারে নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করা শ্রেয়। নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা করে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে রত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সে ধরনের কার্য আধ্যাত্মিক বিলাস, তাতে ঈশ্বরের সেবা করা হয় না, তা স্বার্থপরতার এক চরম নিদর্শন।

প্রশ্ন - ২৭ ঈশ্বর কেন চান সকলে শৃঙ্খলাপরায়ণ হোক ?

উত্তর : শৃঙ্খলা একটি কষ্টকর অভ্যাস। যিনি শৃঙ্খলার শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি ঈশ্বরের পৃথিবীকে বেশি সুন্দর করতে সাহায্য করেন। তাঁর পুণ্যলাভ হয়, তিনি সাংসারিক জীবনে বেশি সাফল্য এবং শান্তিলাভ করেন। শৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিকে ঈশ্বর ভালোবাসেন।

প্রশ্ন - ২৮ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কেন পরিবর্তিত হয়?

উত্তর : যে ব্যক্তি বাস্তবতার প্রয়োজনে নিজের মনোভাব পরিবর্তন করবার মতো বিচক্ষণতার অধিকারী, ঈশ্বরের পৃথিবী তাঁরই। ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, যাঁরা জীবনে কিছুই করেননি, তাঁরা, যাঁরা অল্প কিছু করেছেন, তাঁদের সমালোচনা করবার যোগ্য নন। পরিবর্তন মানুষের জীবনে ধ্রুবতারার মত সত্য, তাকে অস্বীকার করা নির্বুদ্ধিতা ও ক্ষতিকারক। পৃথিবীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে, নিজেকে পরিবর্তিত এবং উন্নততর মানুষ করতে হবে। এর জন্য প্রার্থনা এবং পরিশ্রম দরকার ।

প্রশ্ন - ২৯ জিহ্বা কী করে শাসন করতে হয়?

উত্তর : সঠিক জায়গায় সঠিক কথা বলাই যে শুধু প্রয়োজনীয় তা নয়, প্রলোভন সত্ত্বেও অসময়ে অনুচিত কথা না বলাও একই মাত্রায় প্রয়োজনীয়। অপ্রিয় সত্য শ্রোতার অসন্তোষের কারণ হয়। কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিকে সম্মান

প্রদর্শন জিহ্বার শাসনের মাধ্যমে করতে হবে নতুবা দুর্ভাগ্য পিছনে ধাওয়া করবে। তার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করা উচিত নয়।

প্রশ্ন - ৩০ জীবিকা অর্জনের জন্য বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত?

উত্তর : চেষ্টা বিফল হলে হতাশা আসতে পারে, কিন্তু যদি চেষ্টা না করা হয় তা হলে কোনো আশাই থাকে না। পরাজয়ই চরম ব্যর্থতা নয়। আমাদের কাজের দ্বারাই আমাদের পরিচয় নির্ধারিত হয়, যেমন আমাদের দ্বারা আমাদের কাজ নির্ধারিত হয়। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তারা সৎ জীবিকা অর্জনের জন্য বিপদের ঝুঁকি নেবেন বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে।

প্রশ্ন - ৩১ সাহস কী?

উত্তর : সাহসের অর্থ ভয়কে প্রতিরোধ করা, ভয়কে জয় করা। সাহসের অর্থ, ভয়হীনতা নয়। সাহস ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকার প্রমাণ।

প্রশ্ন - ৩২ সঙ্গী কীভাবে নির্বাচন করা হয়?

উত্তর : প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সঙ্গ প্রজ্ঞাবান করে, মূর্খের সঙ্গ বিনাশের কারণ হয়। সামাজিক সুখদুঃখের অনেকটাই নির্ভর করে সঙ্গী নির্বাচনের ওপর। অন্যায়কারী, অকর্মণ্য ও মূর্খ ব্যক্তির সংসর্গ থেকে দূরে থাকতে হবে, নতুবা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

প্রশ্ন - ৩৩ ঈশ্বর কাকে জীবনে সফল করেন?

উত্তর : সাফল্যের মূল্য কঠোর পরিশ্রম; আরব্ধ কাজে আত্মনিয়োজন, জয় কিংবা পরাজয় যাই হোক ''নিজে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি'' এই নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকতে হবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা করবে না, কারণ বিধির বিধান অনুযায়ী কর্মফল সমস্ত শক্তির সমন্বয়ে নির্ধারিত আনুপাতিক অবশ্যই হবে।

প্রশ্ন - ৩৪ ধর্মে কি পশুহত্যা অনুমোদিত?

উত্তর : ধর্ম আত্মরক্ষা ও খাদ্যের জন্য ন্যূনতম পশুহত্যার অনুমতি দিয়ে থাকে। তবে ন্যূনতমের অধিক আঘাত হিংসার প্রকাশ, অতএব পাপ। অনেক জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ অন্যকে বধ করেই জীবন ধারণ করে, যেমন বাঘ, টিকটিকি, মাকড়সা প্রভৃতি। ঈশ্বর যদি সমস্ত প্রকার হত্যা, এমনকি খাদ্যের জন্যও হত্যা নিষিদ্ধ করতেন, তবে তিনি বাঘ, সিংহ, মাকড়সা ইত্যাদি সৃষ্টি করতেন না।

প্রশ্ন - ৩৫ হিন্দু নারী কি পতির মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করতে পারে?

উত্তর : পতির মৃত্যুর পর হিন্দু নারীকে পুনরায় বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

দৃষ্টান্ত : মহাভারতে হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পিতা রাজা বিচিত্রবীর্যের যখন অকালমৃত্যু হল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পিতামহী রানি সত্যবতী বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বিকাকে বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্মের সঙ্গে সহবাসে বাধ্য করতে চাইলেন। তবে, ভীষ্ম যেহেতু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি বিবাহ করবেন না এবং আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করবেন, তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন সত্যবতীর আর এক পুত্র পরশের সেই অনুরোধে সম্মত হলেন এবং তাঁদের সহবাসের ফলে অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হল। এই ইতিহাস দিকদর্শন করে যে হিন্দু নারী স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় দাম্পত্য জীবন ভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন - ৩৬ যদি আমি জানতে পারি আমার সঙ্গী একটি পাপ করেছে, হিন্দু হিসাবে আমার কি কর্তব্য তাকে পরিত্যাগ করা?

উত্তর : বিপদের সময় নিজের বন্ধুকে পরিত্যাগ না করে সাহায্য করা উচিত। সে পাপী হলেও বিপদের সময়ে পাপীকে সাহায্য করা এবং তাকে আরও পাপ করা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। সে কাজে ব্যর্থ হলে তাকে তখন ত্যাগ করাই ঈশ্বরের প্রিয়।

প্রশ্ন - ৩৭ ধার্মিক ব্যক্তির কি কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা উচিত, না ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা কর্তব্য ?

উত্তর : সংসার ধর্মের অর্থই হল সক্ষম ব্যক্তি মাত্রকেই কাজ করতে হবে, নিজের জন্য এবং অপরের জন্য। যে ভিক্ষা দ্বারা নয়, নিজের শ্রমে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে, ঈশ্বর তার প্রতি সদয় হন। ভিক্ষাবৃত্তি ঈশ্বরের দেওয়া শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার প্রতি নিদারুণ উপহাস। দারিদ্রের জ্বালা সম্যক উপলব্ধির জন্য অল্প কয়েকদিনের জন্য যে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা হয় তা অবশ্য জীবন শিক্ষার অঙ্গ, ওটা ভিক্ষাবৃত্তি নয়।

প্রশ্ন - ৩৮ অন্নদাতার প্রতি কীরূপ আচরণ করা উচিত?

উত্তর : তোমার পরিবারের অন্নদাতা তোমার আনুগত্য লাভের অধিকারী। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ঈশ্বরকে অপ্রসন্ন করে।

প্রশ্ন - ৩৯ ঈর্ষা কীভাবে জয় করা যায়? বর কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত?

উত্তর : ধনী ব্যক্তির উচিত অপেক্ষাকৃত যে কম ধনী তার দিকে দেখা, দরিদ্রের উচিত দরিদ্রতরের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। তাহলে ঈশ্বরের দয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে, ঈর্ষা দূর হবে। তুমি নিজে যা ভালো মনে কর, ঈশ্বরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা কোরো না, প্রার্থনা করো ঈশ্বর তোমার পক্ষে যা ভালো মনে করেন, তোমাকে তাই যেন দেন।

প্রশ্ন - ৪০ জ্ঞান অন্বেষণের ফল কী?

উত্তর : জ্ঞানের অন্বেষণের কারণে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গমন করা যেতে পারে। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সেবা তিনিই করেন, যিনি তাঁর জীবন জ্ঞান লাভের জন্য নিয়োজিত করবেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানের অন্বেষণ করতে হবে। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার জন্য ঈশ্বরের সৃষ্টি পৃথিবীকে জানতে হবে।

প্রত্যেক ধার্মিক জনের উচিত জ্ঞান অর্জন, তিনি নারীই হোন আর পুরুষই হোন। জ্ঞান অর্জনই মানুষকে উচিত এবং অনুচিতের ভেদাভেদ শেখায়, স্বর্গের এবং মর্ত্যের সঠিক পথের সন্ধান দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের ফল সমাজের সকলের উন্নতির জন্য যখন প্রয়োগ করা হয়, জ্ঞান অর্জনের স্বার্থকতা তখনই হয়।

প্রশ্ন - ৪১ ধন সঞ্চয় করলে মানুষ রূঢ় এবং অহংকারী হয়। ধন অর্জনের পশ্চাৎধাবন কি পাপ?

উত্তর : ঈশ্বরের রাজ্যে প্রত্যেক কর্মের বিচার হয় তার পিছনে যে উদ্দেশ্য থাকে তার দ্বারা। অহংকারী ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; রূঢ়ভাষীও পারবে না। ঈশ্বরের প্রতি যে ব্যক্তি অনুগত সেই প্রকৃত ধনী, কারণ তার চিত্তে থাকে সন্তোষ, যা পার্থিব ধন-সম্পদ কাউকে দান করতে পারে না।

পদ্মপত্রে নীরের মতন জগতে অবস্থান করো। প্রভূত প্রচেষ্টার দ্বারা সৎ উপায়ে ধন উপার্জন করো, কিন্তু তার প্রতি আসক্ত হবে না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে জগতে প্রেরণ করেছেন ধরিত্রী মাতাকে অধিকতর সম্পদশালী করবার জন্য। তোমার জীবনে যা কিছু ঘটে সবই তোমার কর্মফল, অন্যায় করলে তাৎক্ষণিক ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করো। অসৎ উপায়ে অর্জিত ধন ফিরিয়ে দাও।

প্রশ্ন - ৪২ কোনো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হতে হলে পুরোহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য কি আবশ্যিক?

উত্তর : না, ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন নেই , ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য উপযোগী, কারণ তার দ্বারা অধ্যয়নে একাগ্রতার সহায়তা হয়। বয়স্কের জীবনে ব্রহ্মচর্য মনের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এমনকি স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে পথভ্রান্তি হয়ে যায়। হিন্দুদের প্রধান দেবতারা, যেমন ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান শিব প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য করেননি এবং কাউকে তা পালন করতেও বলেননি। পুরোহিতের পক্ষে ব্রহ্মচর্য মোটেই আবশ্যিক নয়।

প্রশ্ন - ৪৩ ভিক্ষাদান কি হিন্দুর পক্ষে অবশ্য করণীয়?

উত্তর : ভিক্ষাদান সৎকাজ, কিন্তু অবশ্যকরণীয় নয়। ধর্মের দর্শন শুধু আজকের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য নয়। তা চিরন্তন। ঈশ্বর হিন্দুদের প্রতি দয়ালু এবং ভিক্ষাজীবীর সংখ্যা হিন্দু সমাজে দ্রুত কমে আসছে ।

সম্পদ সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকেরই কাজ করা উচিত; যাতে পৃথিবী সম্পদশালী হয় এবং ভিক্ষার প্রয়োজন অন্তর্হিত হয়। তবে সমাজের সকলের জন্য এবং মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপার্জনের এক শতাংশ দান করা হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য।

ঈশ্বর এই সংসারের সবকিছুর ওপর সবার সমানাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যে নিজের গুণপনায় অথবা জন্মসূত্রের কারণে বেশি ভোগ করার সুযোগ পায়, সে যদি তার আয়ের এক শতাংশ সামাজিক ঋণ হিসাবে শোধ দেয়, ঈশ্বর তাকে বেশি ভোগের দোষে দুষ্ট করেন না।

প্রশ্ন - ৪৪ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে হিন্দুধর্মের কী করা উচিত?

উত্তর : দেবতারা ঈশ্বরের শিক্ষাগুলি ব্যক্ত করেন, বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দানসমূহ আবিষ্কার হয়। বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল, বিজ্ঞান শুধু সেই সম্পদ অনাবৃত করে দেয়।

হিন্দুধর্মের শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের শিক্ষা একই মুদ্রার দু-পিঠ। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, অথর্ববেদের ১৯।৬।২।৩-৫ শ্লোকে 'গগনদুহিতা রাত্রি'র স্তুতি বর্ণনায় তাঁর প্রহরীবৃন্দের সংখ্যাগুলি একটি সমান্তর শ্রেণী অর্থাৎ Arithmatic Progression [99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11........] গঠন করে বলে উল্লেখ করা আছে। আর্যভট্টীয়, ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশেখর, লীলাবতী প্রভৃতি ভারতীয় গণিত গ্রন্থে এই আলোচনার উল্লেখ আছে। সমান্তর প্রগতির সাধারণ পদ এবং প্রথম n-সংখ্যক পদের সমষ্টিসূত্র ব্রহ্মগুপ্তের ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের গণিতাধ্যায়ের ১৭ নং সূত্রে* পাওয়া যায়।

*पदमेकहीनमुत्तरगुणिता संयुक्तमादिनाऽन्त्यधनम्
आदियुतान्त्यधनार्धं मध्यधनं पदगुणनं गणितम् ॥

– ब्रम्हगुप्त

– ब्राम्हस्फुटसिद्धान्त गणिताध्याय १७ सुत्र ॥

*"*পদমেকহীনমুত্তরগুণিতা সংযুক্তমাদিনা হন্ত্যধনম্।*
আদিযুতান্ত্যধনাধং মধ্যধনং পদগুণনং গণিতম।"

এই সূত্রানুসারে, n-তম পদ $t_n = [a + (n - 1)b]$,

মধ্যপদ $M_n = \frac{2a + (n-1)b}{2}$, পদসমষ্টি $S_n = n/2\ [\ 2a + (n-1)b]$.

হিন্দু ধর্ম সমাজ যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আপনার করে নেয়, নতুন সত্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তার সেই স্থিতিস্থাপকতার কারণে হিন্দুধর্ম হাজার হাজার বৎসর বহিঃশত্রুর আক্রমণ, সামাজিক অশান্তি এবং অভ্যুত্থান সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বজায় রাখতে পেরেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সেই মত জীবনধারণ প্রণালীর গুরুত্ব হিন্দু জীবনে অপরিসীম।

প্রশ্ন - ৪৫ হিন্দু পুরোহিতের পক্ষে কোন্ পরিধেয় উপযুক্ত?

উত্তর : বর্তমান জগতে কাজ করার উপযোগী যে কোনো পোশাকই তাঁর উপযুক্ত। ভগবান কৃষ্ণের সময় ধুতি এবং খড়ম প্রচলিত ছিল, পুরোহিতরা তাই ব্যবহার করতেন। কার্যোপযোগী এবং সুলভ পরিধেয়াদির প্রচলন হওয়ার কারণে বর্তমান জগতে কাজ করবার জন্য পুরোহিতরা আধুনিক পোশাক ব্যবহার করতে পারেন। হিন্দু পুরোহিতের জন্য পোশাক এমন হওয়া দরকার যার উপযোগিতা আছে।

প্রশ্ন - ৪৬ একজন পুরোহিত কি ট্রাউজার ও কোটের মতন আন্তর্জাতিক পোশাক পরিধান করতে পারেন?

উত্তর : কর্মের গতি যেখানে দ্রুততা দাবি করে এবং আবহাওয়া যেখানে অত্যন্ত

শীতল সেখানে ট্রাউজার এবং কোট উপযোগী। উষ্ণ আবহাওয়ায় শ্লথগতি সহজ পরিবেশে ধুতি এবং চটি জুতো উপযোগী। তবে সমাজে একজন পুরোহিতের মূল্য তাঁর জ্ঞান, উপদেশাবলি এবং তাঁর কাছ থেকে মানুষ যে শান্তি লাভ করে তার জন্য। এই সমস্ত গুণের কোনোটিই পোশাকের বিধিনিষেধের উপর নির্ভরশীল নয়।

প্রশ্ন - ৪৭ হিন্দুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের উপর তার নিজস্ব পোশাক ধুতির কী প্রভাব?

উত্তর : ধুতি পোশাক হিসেবে অপেক্ষাকৃত সুলভ মুল্যের এবং সামাজিক জীবনে সরল জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়, কিন্তু ধুতিপরিহিত ব্যক্তি দ্রুত গতিতে কাজ করতে অথবা দ্রুত গমন করতে কিংবা আত্মরক্ষার কাজে দ্রুত শরীর চালনা করতে পারেন না। ধুতি পরিহিত হিন্দুরা চিরকালই ট্রাউজার পরিহিত দ্রুত শরীর চালনায় সক্ষম মধ্য-এশীয় আক্রমণকারীদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রশ্ন - ৪৮ জাতীয় গৌরব রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কাজের পক্ষে ধুতি কি আদর্শ পরিধেয়?

উত্তর : ধুতিপরিহিত হিন্দুরা কাজকর্মে শ্লথগতি হয়ে পড়েছিল এবং জাতি ও ব্যক্তি হিসাবে ধনসম্পদ, ক্ষমতা, খ্যাতি, স্বাস্থ্য, বৃহৎ নির্মাণ কর্ম ইত্যাদি লাভের কোনো প্রতিযোগিতাতেই সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এমনকি, উত্তম খাদ্য, উত্তম বাসস্থান, সবল স্বাস্থ্য কিংবা অন্য কোনো প্রকারের স্বাচ্ছন্দ্য তার লাভ হয়নি।

হিন্দুরা গুটিপোকার মতন নিজেদেরকে অক্ষম নির্বোধ আত্ম খোলার মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিল। যে ক্ষেত্রে তার সঙ্গে কেউ কোনওদিন প্রতিযোগিতা করবে না, যেমন প্রায়-অনশনে জীবিকা নির্বাহ অথবা কোনও আরাম ও ধন-সম্পদ ছাড়াই জীবন যাপন অথবা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কে কত অক্ষম ও অযোগ্য সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার আনন্দে একটা মিথ্যা

অহংকারে ভুগছিল হাজার বছর ধরে। সে নিজের জন্য ত্যাগের মিথ্যা অহংকার তৈরি করে নিয়েছিল। ভোগ করার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম এবং জীবন যুদ্ধ করতে হয় এবং নিজেদের যে ভাবে ক্ষমতাবান করতে হয় হিন্দুরা তা প্রায় ভুলে গিয়েছিল। এই প্রতিযোগিতাহীন অস্তিত্বে অনাড়ম্বর ধুতি হিন্দুদের জাতীয় অক্ষমতার এক সুন্দর প্রদর্শন।

প্রশ্ন - ৪৯ হিন্দুর পক্ষে একটি প্রস্তর মূর্তিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতীক বলে পূজা করা অথবা শয়তানের প্রতীক বলে মনে করা কি ঈশ্বর পাপ বলে বিবেচনা করবেন?

উত্তর : এই ধারণা পাপ নয়, কিন্তু প্রস্তর অথবা মূর্তিকে ঈশ্বরের প্রতীক অথবা শয়তানের প্রতীক জ্ঞান করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে একটি বৃহৎ জনসমষ্টিকে এক জায়গায় একত্র করার এটি একটি ভালো উপায়। সমস্ত ধর্মের গুরুরাই কোনও না কোনও ভাবে মানুষকে একত্র করবার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। কোনও কোনও পথের অনুসারীরা ঈশ্বরের ধারণার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্য মূর্তি, মন্দিরাদি, পুস্তক ইত্যাদি ব্যবহার করেন, কেউবা শয়তানের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তর-স্তম্ভ মূর্তির মত ব্যবহার করেন। তবে এসব অতি তুচ্ছ। সকল মহতের মধ্যে মহত্তম ঈশ্বরের মনে রেখাপাত করবার মতো এটা কোনও বিষয়ই নয়।

প্রশ্ন - ৫০ অতি কঠোর বিচারব্যবস্থা, যেখানে চোরের হাত কেটে ফেলা হয়, তা মেনে চললে কি মানব সমাজের ভালো হবে, অথবা ঈশ্বর কি তাতে প্রীত হবেন?

উত্তর : ঈশ্বর সব কিছুর, সব মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর করুণা অসীম, তাঁর নিজের সৃষ্টির প্রতি তিনি হৃদয়হীন হতে পারেন না। চোর অভাবের তাড়নায় চুরি করে। সমাজ সবসময় মানুষকে জীবিকা অর্জনের সহজ সুযোগ করে দেয় না। অনেক সময় সমাজ, এমনকি, জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের জন্যও কোনও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে না।

যে ব্যক্তি এক দেশে নিতান্ত সামাজিক শোষণ ব্যবস্থার শিকার হয়ে ক্ষুধার জ্বালায় চুরি করতে বাধ্য হয়, সেই ব্যক্তি হয়তো অন্য কোনো আর্থিক ভাবে সচ্ছল দেশে চলে গেলে সামাজিক নিরাপত্তা পেতে পারে এবং ভদ্র জীবনযাপন করতে পারে। অতএব চুরি করা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধ নয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার এটি একটি ব্যাধি। চোরের হস্ত কর্তন ঈশ্বর সৃষ্ট ন্যায়নীতি বিরোধী। শাসকরা সাধারণ লোককে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে রাখার জন্য এই আতঙ্কবাদী পন্থা গ্রহণ করে, যেন সাধারণ লোক এর ফলে ভয়ে কম্পিত হয় এবং শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের প্রকৃত অভিযোগসমূহ ব্যক্ত করতে সাহস না পায়।

প্রশ্ন - ৫১ যদি একটি সোজাসুজি বিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যেমন যে-সব নারী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের যদি ফাঁসি দেওয়া হয়, তাতে কি মানবসমাজের মঙ্গল হবে এবং ঈশ্বর প্রীত হবেন?

উত্তর : জীবন থেকে স্বাভাবিক আনন্দ আহরণ করার অধিকার সব নারীরই আছে, সেটি ঈশ্বরের দান। কোনও নারীর যদি অসৎ, কটুভাষী, নির্দয়, রুগ্ন, পুরুষত্বহীন স্বামী থাকে আর সেই নারী যদি অন্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাতে ঈশ্বরের প্রতি তার অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় না। শাসকগণ এবং শাসক সম্প্রদায়ের উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিরা অনেক সময়ে অসৎ, কটুভাষী, নিষ্ঠুর হয়, বিকৃত আচরণ করে। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্য তারা নারীদের ধর্মীয় বিধানের নাম করে দমিয়ে রাখতে চায়। নারী অন্য পুরুষের সঙ্গে যদি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, সে-রকম অবস্থায় নারীর স্বামী শুধুমাত্র নারীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে এবং সমাজ সেই নারীকে কোনও খোরপোষ ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারে। অন্য কোনও শাস্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অপরাধ। তবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা দুজনের স্থায়ী স্বর্গীয় সুখ সুনিশ্চিত করে, সন্তানরা যে ঠিকভাবে মানুষ হবে তার নিশ্চয়তা দেয় এবং ঈশ্বরকে প্রসন্ন করে।

প্রশ্ন - ৫২ আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদের কি অস্ত্রধারণ প্রয়োজন?

উত্তর : চতুর্দশ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক হিন্দুর দেশের আইনে যে ধরনের অস্ত্র রাখার অনুমতি আছে, তেমন অস্ত্র ধারণ করা কর্তব্য। দরিদ্রতম লোকটিরও বাড়িতে একটি লাঠি থাকা অত্যাবশ্যক। অস্ত্র কাছে থাকলে সাহস ও আত্মমর্যাদা লাভ হয়, প্রয়োজনের সময় আত্মরক্ষা করা যায়। সাহসী ব্যক্তিই ঈশ্বরকে যথার্থ ভালোবাসতে পারে। হিন্দুধর্মে দেবতারা, যারা আমাদের আদর্শ, অস্ত্রধারণ করেন।

প্রশ্ন - ৫৩ কী ধরনের জনগোষ্ঠী অথবা মানুষকে হিন্দুদের উৎসাহিত করা উচিত?

উত্তর : যারা হিন্দুদের আত্মমর্যাদা, শক্তি, নিরাপত্তা ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করে, তাদেরই সমর্থন করা উচিত। যারা হিন্দুর স্বার্থের বিষয়ে উদাসীন তাদের বিরোধিতা করা উচিত।

প্রশ্ন - ৫৪ যদি কেউ দেখে যে তার ধর্ম অথবা দেবদেবীকে অপমান করা হচ্ছে তবে তার কী করা উচিত?

উত্তর : নিজের মাকে কেউ অপমান করলে তার প্রতি যা করণীয়, তাই করা উচিত।

প্রশ্ন - ৫৫ অন্য ধর্মের কোনো লোককে হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া কি হিন্দুর উচিত?

উত্তর : অপবিত্র ব্যক্তি এবং সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। অন্য সকল ব্যক্তি যে কোনো হিন্দুর মন্দিরে প্রবেশ করে আধ্যাত্মিক স্বস্তি লাভ করতে পারে। ঈশ্বর কোনো এক সম্প্রদায়ের একার সম্পত্তি নয়।

প্রশ্ন - ৫৬ ভক্ত হিন্দু মন্দির থেকে কী প্রত্যাশা করতে পারেন?

উত্তর : মন্দির এমন একটি স্থান যা সকলের জন্য সব সময় (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত) উন্মুক্ত থাকা উচিত। মন্দিরের কর্তৃপক্ষের উচিত ভক্তদের দক্ষিণার সাহায্যে ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা। মন্দিরের উচিত বিদ্যাদান করা, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ত্রাণ মানুষকে পৌঁছে দেওয়া এবং সমস্ত ভক্তের কল্যাণের জন্য সামাজিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা। মন্দিরে একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ থাকা উচিত যেখানে ভক্তেরা প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সংগীত, ভজন ইত্যাদি করতে পারেন।

প্রশ্ন - ৫৭ রাজনীতি ও ধর্ম কি স্বতন্ত্র হওয়া উচিত?

উত্তর : রাজনীতি একটি বিষয় সম্পর্কে সাধারণের মনোভাব। সেই মনোভাব নির্ভর করে মূল্যবোধের ওপর, মূল্যবোধের জন্ম হয় ধর্মের নীতিসমূহের প্রতি আনুগত্য থেকে। ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত, পরস্পর নির্ভর। এই সম্পর্ককে অবহেলা করা হলে রাজনীতি তখন আর জনসাধারণের জন্য থাকে না, তখন রাজনীতি লোভী এবং পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিদের ক্ষমতালিপ্সার চারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ধর্ম পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হীনবল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মন্তব্য : এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মহাভারত। ভীষ্ম রাজনীতিকে অগ্রাহ্য করে ধর্মকে অবলম্বন করেন। তার ফলে কৌরবদের স্বভাবচ্যুতি ঘটে। তিনি যদি ধর্ম ও রাজনীতিকে মেলাতেন, সত্যবতীর সঙ্গে তাঁর পিতার দ্বিতীয় বিবাহে তিনি সম্মত হতেন, কিন্তু সত্যবতীর পিতার অন্যায় রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করতেন না। সত্যবতীর পিতা বলেছিলেন যে রাজা শান্তনু (ভীষ্মের পিতা)-কে তিনি তাঁর কন্যা দান করতে তখনই সম্মত হবেন যখন ভীষ্ম সিংহাসনের জন্য তাঁর দাবি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবেন। অর্থাৎ রাজপুত্র ভীষ্মকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে এবং রাজধর্ম অর্থাৎ রাজনীতি ত্যাগ করে শুধু ধর্মভিত্তিক জীবন কাটাতে হবে। তাঁর পিতা শান্তনুর কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ভীষ্ম রাজনীতি ত্যাগ করেন ও সেই

শর্তে পরম নিষ্ঠাভরে সম্মত হন। তার পরিণতি হয় সমূহ বিনাশ, কৌরব রাজবংশের অবসান। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ মহাভারতের যুদ্ধে নিহত হয়। ভীষ্ম নিজে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও ধর্মনিষ্ঠ নরপতি হতে পারতেন, কিন্তু রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণ ঘটাতে ব্যর্থ হলেন এবং তার ফলে ভারত একজন শক্তিশালী রাজনীতিক ও শ্রেষ্ঠ রাজা থেকে বঞ্চিত হল। ভীষ্ম রাজা হলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মঙ্গল হত। ভারতের ইতিহাস আজ অন্যরকম হত। আরেকটি উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ। তিনি যা কিছু করেছেন তাতে ধর্ম এবং রাজনীতিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। গীতা তারই ফল। ভগবান কৃষ্ণ ধর্ম ও রাজনীতির মিলন ঘটিয়ে দুরাচারী কৌরবদের শাসনকে দূর করতে পারলেন, পাণ্ডবদের দ্বারা অত্যুত্তম ধর্মনিষ্ঠ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

প্রশ্ন - ৫৮ রাজার সঙ্গে কী রকম আচরণ করা উচিত?

উত্তর : রাজার প্রতি অনুগত থাকা উচিত, যাতে তিনি জাতি গঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ বাধাহীনভাবে করতে পারেন।

জাতি গঠনের অনেক পদ্ধতি আছে এবং কোনও ব্যক্তি হয়তো উৎকৃষ্টতর কোনও পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেন। কিন্তু রাজাকে তাঁর পদ্ধতিটি বাতিল করতে বাধ্য করে কোনও লাভ হবে না। যদি রাজা নিঃস্বার্থভাবে নিজের কাজ করেন, জনগণের আনুগত্য ঐকান্তিক হওয়া প্রয়োজন। রাজা জনসাধারণের জন্য কী করেছেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই ।

প্রশ্ন - ৫৯ মন্দিরের ভক্তমণ্ডলীকে ব্যবহার করে নিজের ব্যবসার উন্নতিসাধন কি করা যায়?

উত্তর : মন্দির কারও ব্যবসার প্রচারকার্যের জায়গা নয়। মন্দির ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার এবং সাধারণ সামাজিক সমস্যাদির আলোচনার জায়গা।

প্রশ্ন - ৬০ পুরোহিত যখন শ্লোকের উচ্চারণে ভুল করেন তখন কী করা উচিত ?

উত্তর : ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের ভুল উচ্চারণ বুঝতে পারবেন এবং তাদের প্রতি সদয় হবেন, তবে পুরোহিত সেই প্রার্থনার ফল পাবেন না। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির যদি শুদ্ধ উচ্চারণ জানা থাকে, তিনি পুরোহিতকে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাবেন, যখন পুরোহিত একা থাকবেন তখন, জনসমক্ষে পুরোহিতকে অপদস্থ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন - ৬১ কোন্ কাজ অধিকতর সম্মানজনক ?

উত্তর : গীতা শিক্ষা দেয় যে কাজের উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই, কোনও কাজই মানুষকে নীচে নামিয়ে আনে না। যে কোনও কাজ যদি সমাজের জন্য করা দরকার হয়, সে-কাজ অবশ্যই ভালো এবং সম্মানজনক।

প্রশ্ন - ৬২ পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে আরও সুখদায়ক স্থান করার কী উপায়?

উত্তর : সবাই পৃথিবীকে বদলাবার কথা বলে, কিন্তু নিজেকে বদলাবার কথা চিন্তা করলে ঈশ্বর অধিকতর প্রীত হন।

প্রশ্ন - ৬৩ ভক্তেরা মন্দিরে গিয়ে মূর্তিপূজা করেন কেন?

উত্তর : মূর্তিপূজার মন্ত্রগুলি দেবতার বিভিন্ন দানের প্রশংসায় ও স্তুতিবাক্যে পূর্ণ। দেবতারা হিন্দু পয়গম্বর, তাঁরা এসেছেন ঈশ্বরের দূত হিসেবে। মূর্তিপূজা বীরপূজার একটি দৃষ্টান্ত। ঈশ্বরের স্তোত্র নিয়মিত উচ্চারণ করলে শ্রেষ্ঠফল পাওয়া যায়।

প্রশ্ন - ৬৪ কোনও দেবতা কি দাবি করতে পারেন তিনি হিন্দুদের শেষ পয়গম্বর বা দেবদূত ?

উত্তর : দেবদূতরা অর্থাৎ দেবতারা সকলেই মানুষ। ঈশ্বর আরও একজন দেবদূত

প্রেরণ করবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁরই পূর্ণ অধিকার, কোনো মানুষ ঈশ্বরের সে অধিকার নিজের হাতে নিতে পারেন না। পৃথিবীর আয়ু আরও বহু শত সহস্র বৎসর। আগামী দিনে নতুন নতুন সমস্যা এবং সমৃদ্ধি আসবে, ঈশ্বর নতুন দেবদূত পাঠাতেই পারেন।

প্রশ্ন - ৬৫ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে কীভাবে সম্মান করা উচিত?

উত্তর : মন্দিরের প্রধান একাধারে সেই মন্দিরের অভিভাবক, অছি, প্রশাসক এবং পুরোহিত। ভক্তদের কর্তব্য মন্দিরের প্রধানের সকল কাজে শ্রদ্ধা সহকারে সহযোগিতা করা, যাতে তিনি নিজ কর্ম ও আচরণবিধি দ্বারা সহজে ভক্তদের এবং সমাজের মঙ্গল করতে পারেন।

প্রশ্ন - ৬৬ হিন্দুরা কি অবিচারকে বিধির লিখন বলে মেনে নেবেন?

উত্তর : হিন্দুরা স্বাধীন ইচ্ছাতত্ত্বে বিশ্বাসী। প্রকৃত হিন্দু কখনোই নত হয়ে অবিচার সহ্য করবে না, যদি না তিনি মেনে নেন যে নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণ করার ক্ষমতা তার নেই এবং ঈশ্বরের সাহায্য পেতে তিনি অক্ষম। বেদ বলছেন, "মানুষের অবস্থা ঈশ্বর পরিবর্তন করবেন না, যতক্ষণ না সে তার নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা নিজে করে"।

হিন্দুরা যখন এবিষয়ে নিশ্চিত হন যে, শাসনপ্রণালীর সুবিচারকে রক্ষা করা প্রধান যাঁর দায়িত্ব, অর্থাৎ রাজা, শাসনপ্রণালীর বিবিধ অনাচার ও ব্যাভিচারের প্রধান স্তম্ভ, তখন হিন্দুরা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নীতিগতভাবে বাধ্য। অন্যথায় ঈশ্বর তাদের প্রতি রুষ্ট হবেন ।

প্রশ্ন - ৬৭ কী ধরনের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা হিন্দুর পক্ষে উপযোগী?

উত্তর : রাজনীতি সরকার গঠন ও পরিচালনার বিদ্যা। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হিন্দু দর্শনের প্রসার সম্ভব হওয়া আবশ্যিক। সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় হবে সেই রাজা, যিনি হিন্দু প্রজাদের উন্নতির জন্য কাজ করেন। যে রাজা হিন্দুধর্মে

পূর্ণ বিশ্বাসী না হয়েও তার লক্ষ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল তিনিও গ্রহণযোগ্য। যে রাজত্ব হিন্দুধর্মের প্রতি দায়বদ্ধ কিংবা অন্তত হিন্দুধর্মের অনুকূল, হিন্দুদের উচিত সেই সরকারের স্থায়িত্বের জন্য কাজ করা। অপরপক্ষে হিন্দুর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন কোনও রাজত্বে যখন কোনও হিন্দু বাস করেন, তাঁর উচিত যখনই সুযোগ পাবেন, সেই হিন্দু বিদ্বেষী রাজার উৎখাতের জন্য সংগ্রাম করা।

প্রশ্ন - ৬৮ কখন এবং কীভাবে হিন্দুর একজন শাসনকর্তার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করা উচিত?

উত্তর : যখন, কার রাজা হওয়া উচিত এবং কেন আমরা রাজার বাধ্য হব, এ-সব বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তখন সমস্ত সচেতন হিন্দুর উচিত ইতিহাস পর্যালোচনা করা এবং তাঁর স্বধর্মীদের সাথে আলোচনা করা। যখন হিন্দুরা কোনো বিরুদ্ধভাবাপন্ন রাজত্বে বাস করেন তখন অবাধ্যতার তাগিদ আরও প্রবল হবে, কেননা বিদেশীদের কিংবা তাঁদের সহযোগীদের শাসনে অনেক শতাব্দী ধরে বহু সংখ্যক হিন্দু দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন।

অবিচার এবং অবহেলার প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে, অবশ্যই করতে হবে এবং এই অধিকার নিরবিচ্ছিন্নভাবে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে বিষয়ে হিন্দুদের অবহিত থাকা উচিত, তা হল, ঈশ্বর এই প্রতিরোধের কাজের সুফল সর্বদা অবশ্যই প্রদান করেন। প্রতিরোধ না করা একান্তভাবে ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা এবং বিশ্বাস ভঙ্গের সামিল।

প্রশ্ন - ৬৯ একজন হিন্দু নেতা তাঁর পদ, জাতি অথবা গোষ্ঠীকে কি হিন্দুদের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করতে পারেন? কোন ব্যক্তি হিন্দুদের শত্রু?

উত্তর : ঈশ্বর কর্মের উচ্চ-নীচ ভেদ জানেন না, যদি কোনো কাজ আবশ্যক হয় তাহলে সে কাজ অবশ্যই হিতকর। রাজনৈতিক নেতাকে হিন্দুদের

একতাবদ্ধ করে প্রগতিশীলতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার নেতৃত্ব দিতে হবে এবং নেতাকে সর্বদা তার পদ এবং ক্ষমতা হিন্দুধর্মের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবহার করতে হবে।

যে কেউ, যিনি রাজনৈতিক পদ্ধতি অথবা তত্ত্ব যদি এমনভাবে ব্যবহার করেন, যাতে হিন্দুদের মধ্যে কোনও প্রকার বিভেদ সৃষ্টি হয়, তিনি ঈশ্বরের শত্রু এবং তাঁর দ্রুত বিনাশ কর্তব্য।

প্রশ্ন - ৭০ এ কি ঠিক যে একেশ্বরবাদীরা যারা মূর্তিপূজার বিরোধী, তাঁদের দ্বারা মানব জাতির বহুধা কল্যাণ বা উন্নতিসাধন হচ্ছে? উপবাস কি পাপ স্খালন করে?

উত্তর : চিকিৎসাশাস্ত্র, খাদ্য প্রযুক্তি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং গণিত প্রভৃতিতে মূর্তি পূজার বিরোধীদের অবদান নগণ্য, তাদের মতান্ধতা কেবলমাত্র নিরীহ দুর্বল ব্যক্তি, নারী ও জীবজন্তুর উপর অত্যাচারকে এবং হিংসাকেই আইনসিদ্ধ করে। তারা শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের দৈহিক ও মানসিক দাসত্ব নিশ্চিত করে, তারা অপরাধীদেরকে সমস্ত রকম অপরাধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করায় এক অলীক প্রতিশ্রুতির সাহায্যে যে, ঈশ্বর তাদের সব পাপ মোচন করে দেবেন, যদি তারা মাত্র কয়েকদিন দিবাভাগে তাদের সমস্ত প্রকার খাদ্যগ্রহণ সংযত করে।

যেই দিন মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবাই সমভাবে পাবেন সেইদিন মূর্তি ধ্বংসকারীরা বুঝবেন কেন এবং কে তাদের এক মিথ্যার পিছনে শুধুমাত্র দলবৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করছে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর দেওয়া শিক্ষার খোলামেলা আলোচনায় সত্য উৎঘাটিত হবে, ব্যক্তিদের লোভলালসা প্রকাশ হবে। ঈশ্বর প্রীত হবেন। যে বাণী সত্যই ঈশ্বর প্রদত্ত, সেই বাণীর আলোচনা, সমালোচনায় কারুর ভীত হওয়ার কারণ নেই।

পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ধাবমান - এটি একটি সত্য। এই সত্যের খোলাখুলি আলোচনা বা সমালোচনায় সূর্য বা পৃথিবীর কোনো ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না।

কিন্তু যদি কেউ বক্তব্য পেশ করেন যে সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ধাবমান এবং নিজ বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য সকলের স্বাধীন আলোচনা করার অধিকার মৃত্যু ভয় দেখিয়ে হরণ করেন তবে ঈশ্বর সেক্ষেত্রে রুষ্ট হন। হিন্দুদের মধ্যে যারা মূর্তি পূজার ঘোর বিরোধী এবং একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর, তাদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বর যদি মূর্তি পূজায় অপমানিত বোধ করতেন তবে তিনি মুহূর্তে সমস্ত মূর্তি এবং তার পূজকদের ধ্বংস করতেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য অংশীদার নিতেন না। ঈশ্বরের সাম্রাজ্য চালাবার জন্য অংশীদারের বা দালালের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইহা সত্য যে মূর্তিপূজা অপেক্ষা সরাসরি ঈশ্বরের পূজা বেশি ফলদায়ী।

প্রশ্ন - ৭১ নিষ্ঠুর শত্রু এবং লোভান্ধ সৈন্যবাহিনী সকল কীভাবে সমগ্র জাতিসমূহকে পদানত করে?

উত্তর : গোষ্ঠীর অভ্যন্তরস্থ এবং গোষ্ঠী বহির্ভূত মনস্তত্ত্ব চিরকাল নিজেদের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণার বশবর্তী মানসিক রোগীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। তাদের অধিকার বিস্তৃত করার জন্য, লোভান্ধ সেনাধিপতি নিজেদের লোকদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করে যেন নিরুপায় মানুষ ঘৃণ্য বধ্য ও তাদের স্ত্রীদের ধর্ষণ ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের সহায়ক। নিজেদের অধিকারের ক্ষেত্র প্রসারকামীরা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে সৈন্যদের নরকের ভয় দেখায় এবং নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। যে কোনও মুক্ত চিন্তা এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সম্ভাব্য অভ্যুত্থান রোধ করার জন্য তারা ঈশ্বরের নাম ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে।

প্রশ্ন - ৭২ একজন সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন হিন্দুরাজা, যিনি সর্বক্ষণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যশাসন করেন, তিনিই কি বিকল্প ব্যবস্থায় সর্বশ্রেষ্ঠ?

উত্তর : যদি রাজা শাসক এবং শাসিতের মধ্যে পরামর্শ প্রচলিত করেন তবে ঐশ্বরিক বিচার ব্যবস্থায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অধিকার কার্যকর হবে

এবং সর্বসাধারণের জন্যে গণতন্ত্র সুনিশ্চিত হবে।

তবে কার সঙ্গে পরামর্শ করবেন যেহেতু তা সর্বময় রাজার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে, অবিচারের বিরুদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থার আলোচনা শুধুমাত্র রাজার পছন্দমত কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই তা প্রায়শই জনগণের স্বার্থে কার্যকর হয় না। অতএব সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন হিন্দু রাজার শাসন কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নয়।

প্রশ্ন - ৭৩ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমিতি কী অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের কাজ করতে পারে?

উত্তর : সমস্ত মানব ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অন্যায়কারী রাজা চিরদিনই সমাজের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিসমষ্টি এবং নৈতিক খ্যাতিসম্পন্ন উচ্চ ধর্মযাজকদের আহ্বান করে তরবারির ভয় দেখিয়ে অথবা অনুগ্রহ বিতরণ করে নিজের কর্মকাণ্ডে তাঁদের সম্মতি আদায় করে নেন। পরে তিনি প্রচার করতে থাকেন যে তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ লাভ করেছেন। ফলত সাধারণ লোক ধীরে ধীরে তাদের এই অদৃষ্টকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সমিতি অত্যাচারী শাসককে প্রতিরোধ করতে পারে না। গণতন্ত্রই হিন্দুদের রক্ষা কবচ।

প্রশ্ন - ৭৪ সমগ্র সমাজের জন্যে কি সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন শাসন ভালো, না সকলের সহমতের ওপর যার ভিত্তি তেমন শাসন ভালো?

উত্তর : ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে কোনোদিনই সমগ্র জনগণ শাসককে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেননি, সর্বদাই তা হয়েছে শক্তির প্রয়োগে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, যারা সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন শাসকের সমর্থক, তারা প্রায়সই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা। প্রচ্ছন্ন সত্য হল যে, এরা ভয়ে বা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজাকে মেনে নেন। সকলের সহমতের ওপর যার ভিত্তি অর্থাৎ গণতন্ত্রের মাধ্যমে শাসক নির্বাচনই কাম্য।

প্রশ্ন - ৭৫ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কী করা উচিৎ ? কেমনভাবে পূজা করা উচিৎ ?

উত্তর : ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ পূজা। উত্তেজক পানীয় ইত্যাদি পরিহার করো, তা অস্বাস্থ্যকর ও ঈশ্বরের অপ্রীতিভাজন। সপ্তাহে একদিন অন্তত মন্দিরে গিয়ে সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পন্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের সমবেতভাবে প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ পূজা।

প্রশ্ন - ৭৬ ঈশ্বরের পূজার জন্যে আমাদের কি উপবাস করা প্রয়োজন ?

উত্তর : পূর্ণিমার দিবাভাগে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত উপবাস করবে এবং চন্দ্রোদয়ের পর পালাক্রমে সামাজিক ভোজের আয়োজন করবে। বন্ধু এবং পরিচিতবর্গকে নিমন্ত্রণ করা উচিত, তাতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ হয় এবং ভক্তরা সুস্বাস্থ্য ও প্রভূত ধনলাভ করেন। অন্যান্য দিন পূজা করা উচিত পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান করে, দুশ্চিন্তামুক্ত চিত্তে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপবাস নিষ্প্রয়োজন। ভক্তজনের বিশ্বাস, ভোজ- উৎসবে যত জনকে তুমি নিমন্ত্রণ করবে, তোমার সেই সংখ্যক পূর্বপুরুষ খাদ্য পাবেন। ভোজ উৎসবে প্রতিমাসে একদিন নিমন্ত্রণ করা উচিত অথবা অন্যের ভোজ উৎসবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত, উভয় ক্ষেত্রেই সুফল লাভ হয়।

প্রশ্ন - ৭৭ পুরোহিত কে হতে পারেন ?

উত্তর : বিশ বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্ক যে কোনো সৎচরিত্র পুরুষ ও নারী পুরোহিত হতে পারেন। পুরোহিত শিক্ষিত হবেন, তাঁর নৈতিক চরিত্র ভালো হবে, সুবক্তা হবেন, হিন্দুশাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্ন হবেন। পুরোহিত সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কাছে বেদ, গীতা, উপনিষদের গুরুত্ব, উন্নত জীবন যাপনের কাজে যা প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যা করতে এবং ভজন গান করতে সক্ষম হবেন। পুরোহিত সাহসী হবেন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সু-অভ্যাসযুক্ত হবেন। পুরোহিত এমন একজন হবেন যিনি নিজের সন্তানদের এবং ভক্তদের সমান ভালোবাসবেন ও যত্ন করবেন। পুরোহিত ভক্তদের পূজায় নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন। সামাজিক উন্নয়নেও তিনি নেতৃত্ব দেবেন।

প্রশ্ন - ৭৮ দেবতাদের পূজা কীভাবে করতে হয়?

উত্তর : অন্তত পনেরোটি মন্ত্র উচ্চারণ অবশ্য করতে হবে। পনেরোটি মূল মন্ত্র উচ্চারণের পর, যে দেবতার জন্য উৎসব, সেই দেবতার মহৎ কীর্তিসমূহের গুণকীর্তন করা যেতে পারে। বিশেষ দেবতার মহান অবদান স্মরণ করতে হবে। তাতে ভক্তরা তাঁকে অনুকরণ করতে উৎসাহিত হবেন। পুরোহিত স্মৃতি থেকে অথবা পুথি থেকে এসব আবৃত্তি করবেন। শুধুমাত্র প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোনও পূজা উপচার অপ্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের খাদ্য, বস্ত্র, গহনার বা অর্থের প্রয়োজন নেই। ভক্তের ধনসম্পদ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ উৎসর্গ প্রদত্ত হয়, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য নেই। ঈশ্বর প্রার্থনা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন - ৭৯ পুরোহিতের আয় কী হওয়া উচিত?

উত্তর : মন্দিরের কোষ থেকে পুরোহিতের বেতন দিতে হবে। বেতন এমন হতে হবে যেন পুরোহিত সমাজে উন্নত, সচ্ছল ও সম্মানীয় জীবন যাপন করতে পারেন। পুরোহিতকে যেন ভক্তদের কাছে দানের জন্য হাত পাততে না হয়। ঈশ্বর আমাদের যে জীবন এবং ধনসম্পদ দান করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং সৌভাগ্যলাভের স্বর্গীয় দায় মুক্তির জন্য মন্দিরের কোষে অথবা হিন্দু সামাজিক সংগঠনে ভক্তদের নিজস্ব মাসিক আয়ের এক শতাংশ দান করা স্বর্গীয় কর প্রদানের সমতুল্য।

প্রশ্ন - ৮০ মন্দিরের জন্য কিংবা অন্যান্য সামাজিক উদ্দেশ্যে দান ভক্তের কর্তব্য কেন?

উত্তর : জগতের সকল মানুষকে ঈশ্বর সমান ভালোবাসেন। তবে, নানা কারণে অন্যদের তুলনায় কোনো কোনো ব্যক্তির আয়ের ক্ষমতা অধিক, কেউ কেউ জগতের ধনসম্পদের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশ ভোগ করেন, যদিও সকলেরই তার সমান অংশ পাওয়া উচিত। অন্যদের সঙ্গে নিজের আয়

কিছু অংশে ভাগ করে নিলে, অধিকতর আয় এবং সম্পদসৃষ্টির বিশেষ সুবিধা ভোগজনিত যে পাপ তার মোচন হয়। মন্দির এবং অন্যান্য সামাজিক সেবার দানের মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা ভোগজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যদি অন্তত মাসিক আয়ের এক শতাংশ নিয়মিত দান করা হয়।

প্রশ্ন - ৮১ কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে দান কর্তব্য?

উত্তর : মন্দির নির্মাণের ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ, ক্ষুধার্তের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য ঔষধ ও ত্রাণ, সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা, কর্মপ্রার্থীর জন্য প্রশিক্ষণ, ভয়ার্তের জন্য নিরাপত্তা দান ঈশ্বরকে প্রীত করে।

প্রশ্ন - ৮২ প্রার্থনার জন্য কত সময় দেওয়া উচিত?

উত্তর : দিনে দুবার প্রার্থনা করা উচিত, একবার অতি প্রত্যূষে, আরেকবার শয্যাগ্রহণের পূর্বে। প্রার্থনায় ন্যূনপক্ষে প্রায় পাঁচ মিনিট ব্যয় হয়। তবে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার পরে বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনা করা যায় এবং তাতে কয়েক ঘণ্টা সময়ও ব্যয় হতে পারে। পুরোহিতের সতর্ক থাকা উচিত বয়োবৃদ্ধ, শিশু এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের পক্ষে প্রার্থনার সময়কাল যেন কষ্টকর না হয়। দিনে দুবার পাঁচ মিনিট করে প্রার্থনা এবং একবার দশ মিনিট প্রাণায়াম করতেই হবে। তাতেই ঈশ্বরের প্রীতি এবং স্বর্গ প্রাপ্তির আশীর্বাদ লাভ করা যায়।

প্রশ্ন - ৮৩ মন্দিরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রার্থনার জন্য কীভাবে দাঁড়ানো উচিত?

উত্তর : এক এক সারিতে কক্ষের আকার ও ভক্তের সংখ্যা অনুযায়ী ন-জন/বারোজন ভক্তদের দাঁড়ানো উচিত এবং সে ভাবে ন-টি এবং বারোটি সারিতে দাঁড়ানো উচিত। অর্থাৎ ন-জন করে প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ন-টি পঙ্‌ক্তি অর্থাৎ ৮১ জন দাড়াঁতে পারবেন। যদি ২২ জন থাকেন, প্রথম ও দ্বিতীয়

পঙ্‌ক্তিতে ৯ এবং ৯ অর্থাৎ ১৮ জন দাঁড়াবেন এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে ৪ জন দাঁড়াবেন। মন্দিরে হুড়োহুড়ি করা ঈশ্বরের প্রতি অবমাননা।

প্রশ্ন - ৮৪ মন্দিরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নারীদের নির্দিষ্ট অবস্থান কোথায় হবে?

উত্তর: ভক্তমণ্ডলীর আকার অনুযায়ী বাঁদিকের পঙ্‌ক্তিগুলির এবং সারিগুলির অর্ধেক নারীদের জন্য থাকবে।

প্রশ্ন - ৮৫ দৈনিক প্রার্থনা কেন প্রয়োজন?

উত্তর : প্রার্থনা এক অদৃশ্য অস্ত্র, তার দ্বারা বহু বিপদের থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সুস্বাস্থ্য এবং প্রভূত ধন অর্জনের সহায়তা হয়। পার্থিব জগতে সর্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভ হয় এবং অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। একশত বছর পরে কোনো ব্যক্তির সাফল্য এবং বিফলতার কথা সবাই ভুলে যাবে, কিন্তু আজকের প্রার্থনা তাকে অনন্তজীবনের পথ দেখাবে।

প্রশ্ন - ৮৬ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কী করে লাভ হবে?

উত্তর : যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ করতে অত্যুগ্র আগ্রহী, ঈশ্বর তাকে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন।

প্রশ্ন - ৮৭ ঈশ্বরের সম্মান রক্ষার জন্য হিন্দুর কি অন্য ধর্মের মানুষের শত্রু হওয়া উচিত?

উত্তর : শুধুমাত্র যারা অহংকারী ও নিজেদের খুব বড়ো মনে করার মত মূর্খ তারাই ভাবে তারা ঈশ্বরের সম্মানের রক্ষাকর্তা এবং অস্বীকার করে যে ঈশ্বরই সমস্ত জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দূতদের মাধ্যমে তাদেরকে ধর্মাচরণের রীতিনীতি শিখিয়েছেন। ঈশ্বর না চাইলে কে বেঁচে থাকতে পারে? কেইবা নিজের ধর্ম আচরণ করতে পারে? অন্য ধর্মের মানুষকে শত্রু নয়, বন্ধু করে নিতে হবে।

প্রশ্ন - ৮৮ কে স্বর্গে যাবে এবং কে নরকে যাবে?

উত্তর : পৃথিবীতে দুই প্রকৃতির মানুষ আছেন, সুর ও অসুর। সুর তাঁরা যারা কাজ করেন, সম্পদ সৃষ্টি করেন এবং অন্যদের সঙ্গে তা ভাগ করে নেন, যাতে পৃথিবী সকলের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অধিকতর সুখকর বাসস্থান হয়। ঈশ্বর তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা অনন্তকাল স্বর্গে বাস করবেন। অসুর সেই সমস্ত মানুষ যারা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে জীবনধারণ করে অথবা ঘৃণা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। অসুরেরা শয়তানের মনোবৃত্তির মূর্তিমান মানব বিগ্রহ, তারা অনন্তকাল নরকে দগ্ধ হবেন।

প্রশ্ন - ৮৯ কেউ যদি কোনো পাপ কিংবা অপরাধ করে, পূজা করলে কিংবা ঈশ্বরকে ভোগ দিলে কি পাপের শাস্তির লাঘব হবে?

উত্তর : ঈশ্বর কিংবা কোনো দেবতা উৎকোচের দ্বারা প্রভাবিত হন না। পূজা দিলে তাতে একমাত্র দরিদ্র পুরোহিতদের উপকার হয়। পাপের শাস্তির লাঘব হয় না। আন্তরিক অনুতাপ, ক্ষতিগ্রস্তকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দান এবং নিয়মিত প্রার্থনাই একমাত্র ঈশ্বরের প্রেম ও আশীর্বাদ পুনরায় লাভ করা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন - ৯০ হিন্দুরা কি বিদ্রোহের পরিবর্তে ধৈর্যেরই প্রতিমূর্তি নয়?

উত্তর : অন্তত এক সহস্র বৎসর হিন্দুরা বিদেশী শাসনের অধীনে থেকেছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়নি এবং সে কারণেই বিদেশীদেরকে প্রতিহত করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। বিদ্রোহের পরিবর্তে তারা তাদের অপমানজনক অস্তিত্বকে অহিংসা ও শান্তিপ্রিয়তার ছদ্মবেশে লুকিয়ে রাখে। তারা অনেক দার্শনিক মতবাদের উদ্ভাবন করে হিন্দুসমাজকে পুরুষত্বহীনতার সদর্থক বানিয়ে দেয়। কাপুরুষতা ও দাসত্বের মনোভাবের জন্য তারা নৃশংস অত্যাচার সহ্য করেছেন শত শত বৎসর। অত্যাচার প্রতিরোধের অক্ষমতা ঢাকার জন্য সহ্য শক্তির অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে গর্ব বোধ আরম্ভ করেন। অন্যায় সহ্য করার ধৈর্য ঈশ্বর অবমাননার সমতুল্য ।

প্রশ্ন - ৯১ শয়তান, যে ঈশ্বরের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে, তাকে বিনাশ করার জন্য হিন্দুর কী করা উচিত?

উত্তর : হিন্দুরা বিশ্বাস করে, ঈশ্বর অনাদি অনন্ত এবং সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। শয়তান তাঁর সমকক্ষ হতেই পারে না। যদি কেউ বিশ্বাস করে ঈশ্বরের রাজত্বে শয়তানের অস্তিত্ব আছে এবং সে ঈশ্বরের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর অসহায় এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বরের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে শয়তানের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

শয়তানের চরিত্র ও কীর্তিকলাপ সম্পূর্ণ নশ্বর ঘটনা। ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞান ও বিচারশক্তি দিয়েছেন। ঈশ্বর প্রদত্ত গুণের অসৎ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ শয়তান হতে চায়, নৃশংসভাবে দৈহিক কামনার তৃপ্তি, শক্তি ও ধন সম্পদ লাভের জন্য মানুষ শয়তানি করে।

প্রশ্ন - ৯২ ঈশ্বরের রাজত্বে এই পরস্পর বিরোধিতা কেন যে, কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ সাধুচরিত্র, কেউ আতঙ্কবাদী?

উত্তর : পৃথিবীতে জীবনকাল স্বল্পস্থায়ী। শিক্ষার জন্য মানুষকে বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলি। কীভাবে জীবনযাপন করব তা ঠিক করি। এই পৃথিবীতে আমাদের স্বল্পকালের কর্মের দ্বারা আমাদের স্বর্গ কিংবা নরক বাস স্থির হয়। আমাদের বিচারবুদ্ধি এবং শিক্ষার দ্বারা নিজেরাই ঠিক করি আমরা ভালো হব না মন্দ হব, সাধুচরিত্র হব, না আতঙ্কবাদী হব।

প্রশ্ন - ৯৩ কেউ যদি অবিরত ঈশ্বরের প্রার্থনা না করেন ঈশ্বর কি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন?

উত্তর : ঈশ্বর যদি চাইতেন যে, মানুষ অবিরত তাঁর কাছে প্রার্থনা করুক, তিনি মানুষকে নিজের কাছেই রেখে দিতেন, যাতে মানুষ সর্বক্ষণ প্রার্থনা করতে থাকে। ঈশ্বর এত বিরাট যে এইসব ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত হন না,

তবে মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান জীব, তাই সে প্রার্থনা করবার সুযোগ পায়। প্রার্থনা থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য এবং অনন্ত জীবনের জন্য শক্তি পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে সারাজীবনে যতকিছু সাফল্যলাভ করা যায়, ঈশ্বরের সন্নিধানে এক ঘণ্টায় তার চেয়ে বেশি ফললাভ করা যায়। *

* মন্তব্য : *দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজন মানুষ যদিসমুদ্রতীরে বাস করে অথচ নিয়মিত সমুদ্রস্নান না করে, তাতে সমুদ্রের কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু নিয়মিত সমুদ্রস্নানে স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভ হয়। তেমনই নিয়মিত প্রার্থনা এবং প্রাণায়াম করলে আমরা লাভবান হই, ঈশ্বরের লাভ ক্ষতি কিছু হয় না।*

প্রশ্ন - ৯৪ সব মানুষ যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়, তাতে কি ঈশ্বর প্রীত হবেন?

উত্তর : ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হত যে শুধু ঈশ্বরের নামেই সকলে পূজা দিক, তিনি তা এক মুহূর্তে করতে পারতেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। যারা প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা জোর করে অন্য ধর্মের মানুষকে নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে দল সৃষ্টি করেন, প্রকৃতপক্ষে তারা ঈশ্বরকে অপমান করেন। তারা ঈশ্বরকে নপুংসক, সৃষ্টিক্ষমতা-রহিত বলে মনে করেন।

বিভিন্ন মানবজাতির বিভিন্ন রীতির উপাসনা যদি ঈশ্বরের অপছন্দ হত, ঈশ্বর তা হতে দিতেন না। সকলেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে একমাত্র ঈশ্বরেরই নামগান করতেন।

বাস্তবিক সত্য হল যে ঈশ্বরেরই প্রীতি অনুযায়ীই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাঁদের নিজের নিজের রীতিতে উপাসনা করেন। তবে, যে-রীতিতেই করা হোক, সব প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছেই পৌঁছে যায়।

প্রশ্ন - ৯৫ ব্যক্তি মানুষের মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বর কী রূপে দায়ী?

উত্তর : বেদের বিভিন্ন স্তোত্র অনুযায়ী ব্যক্তির মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বরের কোনো দায়িত্ব নেই। মোক্ষ মানুষের নিজের কর্মের ফল।

প্রশ্ন - ৯৬ ভগবান কৃষ্ণের মতো একজন দেবতা কেন তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করে হিন্দু জনসাধারণকে দারিদ্র ও অস্বাস্থ্য থেকে মুক্ত করে আধুনিক জাতিতে পরিবর্তিত করতে পারলেন না?

উত্তর : বেদের বিভিন্ন শ্লোকে বলা হয়েছে যে দেবতাদের কাজ হিসেবে প্রাজ্ঞ উপদেশ দান। তাদের কাজ ধর্মনিষ্ঠ আচরণের দ্বারা ঈশ্বরের বাণী প্রচার, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। মানবজাতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হিসাবে কাজ করা থেকেতাদের সতর্কভাবে নিবৃত্ত করা হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণ অথবা অন্য কোনও দেবতা ঈশ্বরের ক্ষমতা স্বহস্তে নিতে পারেন না। আধুনিক দারিদ্রমুক্ত স্বাস্থ্যজ্জ্বোল জাতিতে পরিণত হতে হলে, আধুনিক, মানবিক মানসিকতার প্রয়োজন এবং তা সম্ভব জাতির সকলে যখন শিক্ষিত এবং কুসংস্কার মুক্ত হবে।

প্রশ্ন - ৯৭ কোনো হিন্দু নারী যদি নিজেকে উপযুক্ত পোশাকে আবৃত না রাখেন, ঈশ্বর কি তাতে অসন্তুষ্ট হন?

উত্তর : ঈশ্বরের প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতার সঙ্গে পোশাকের কোনও সম্পর্ক নেই। এসব সামান্য বস্তুর পক্ষে ঈশ্বর অত্যন্ত বিশাল। নারীর পোশাকের নিয়ম-বিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে সমাজের পুরুষের স্বভাব ও চরিত্র প্রতিফলিত হয়। পুরুষেরা যেখানে শিক্ষিত ও সভ্য সেখানে হিন্দু নারীরা স্বাধীনভাবে তাদের পোশাক ও তার রীতিনীতি নির্ধারণ করতে পারে ।

প্রশ্ন - ৯৮ আমাদের কি হিন্দুধর্মাবলম্বী চিহ্ন ধারণ করা উচিত?

উত্তর : প্রত্যেকের উচিত সে যে হিন্দু তা প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করা এবং তার ধর্মের কথা বলা। তার ধর্মের বাণী প্রচার করা। সেই সেবার দ্বারা ঈশ্বর তৃপ্ত হন।

প্রশ্ন - ৯৯ হিন্দুর পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও নীতিসম্মত খাদ্য কী ?

উত্তর : বৈদিক যুগ থেকে আমিশাষী এবং নিরামিশাষী হিন্দু ছিল। যে-সব স্থানে তরি-তরকারি এবং ফলমূলের প্রাচুর্য সেখানে শাকাহারই প্রচলিত। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে একটি ঘাসের শিসও জন্মায় না। সেখানে জীবনধারণের জন্য মানুষ আমিষ ভোজন করতে বাধ্য হয়। খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জীবনে নৈতিকতার কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন - ১০০ ভারতে গোমাংসভক্ষণকারীদের জন্য কি শাস্তি নির্দিষ্ট ?

উত্তর : গরু যেহেতু ভারতের কৃষি ও অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ, তার নিধন নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। ভারতের মতন জনবহুল, ক্ষুধার্ত ও দারিদ্রপীড়িত দেশে খাদ্যের জন্য গোহত্যার অনুমতি যদি দেওয়া হয়, দেখতে দেখতে গরু খেয়ে শেষ করে দেওয়া হবে এবং তার ফলে ক্রমাগত অজন্মা ও দরিদ্রদের অনাহারে মৃত্যু আরম্ভ হবে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করতে কৃষির জন্য গোহত্যা নিষেধ করতেই হবে। সেই জন্যই ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণকারীর শাস্তি হল নরকভোগ।

প্রশ্ন - ১০১ কোনো কোনো হিন্দু দেবতাকে একাধিক হস্তপদ ও মস্তকবিশিষ্ট দেখানো হয় কেন?

উত্তর : অস্ত্রের ব্যবহারে কিংবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেবতাদের অতিমানবিক ক্ষমতা, কাহিনীকারেরা অতিরঞ্জিত করে বলতেন এবং দেবতাদের সম্পর্কে বল্গাহীন কল্পকাহিনী রচনা করতেন। তার ফলে শিল্পী ও ভাস্করেরা কাহিনীকারের অবাধ কল্পনাকে অস্বাভাবিক রূপ দান করেছেন।

দেবতারা সকলেই মানুষ ছিলেন, কেউই প্রকৃতির নিয়মের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। দেবতাদের সকলেরই একটি করে মস্তক ও দুটি করে হস্ত ছিল। হিন্দু মন্ত্র এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

ॐ त्रिमस्तकानां ज्ञानम् एकशिरे अवस्थितं
चतुर्बाहुतुल्यबलं द्विहस्ते रोपितम् ॥
भक्तेच्छापूरणार्थं पुनः पुनः आविर्भूतम्
प्रणमामि त्वां हि ईश्वरप्रेरितदूतम् ।

ওঁ ত্রিমস্তকানাং জ্ঞানম্ একশিরে অবস্থিতং
চতুর্বাহুতুল্যবলং দ্বিহস্তে রোপিতম্ ।
ভক্তেচ্ছাপূরণার্থং পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতম্
প্রণমামি তং হি ঈশ্বরপ্রেরিতদূতম্ ।

হে ঈশ্বর, তুমি মনুষ্যরূপে বারংবার তোমার দূতদের প্রেরণ করেছ। সেই দূতেরা অতি প্রাজ্ঞ এবং তাঁদের একটি মস্তকে তাঁরা তিনটি মস্তকের শক্তি ধারণ করেন। তাঁদের দুটি হস্ত এত শক্তিশালী যে মনে হয় যেন চারটি হস্ত অস্ত্রচালনা করছে।

প্রশ্ন - ১০২ ইন্দ্র দেবতাকে লম্পট করে চিত্রিত করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও হিন্দুরা কেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ?

উত্তর : দৈহিক শক্তি এবং সামরিক কৌশলে ইন্দ্র ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি অতি বুদ্ধিমান রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন, অতি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু নিজের কাম প্রবৃত্তির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং তিনি অনেক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। হিন্দুরা ইন্দ্রের অতিমানবিক গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁর কলঙ্ককে শ্রদ্ধা করেন না। ইন্দ্রের কাহিনী হিন্দুদের শিক্ষা দেয় যে প্রতিভাশালী মানুষমাত্রই সর্বদা সর্বগুণসম্পন্ন নির্মল চরিত্রের হবেন তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মন্তব্য : (১) এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে একজন ডাক্তার খুব বড়ো শল্যচিকিৎসক হয়েও কর ফাঁকি দিয়ে দেশকে প্রবঞ্চিত করেন।

(২) অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সর্ব যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে বঞ্চনা করে অন্য এক নারীকে বিবাহ করেছিলেন।

এইসব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ত্রুটি সত্ত্বেও এরা সাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন, তাঁদের প্রতিভা ও অবদানের জন্য। ইন্দ্রের কাহিনী কোনও ব্যতিক্রম নয়।

প্রশ্ন - ১০৩ যাঁরা মোক্ষলাভের অন্য পথে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সঙ্গে হিন্দুদের কী রকম ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর : যাঁরা মোক্ষলাভের অন্য পথে বিশ্বাস করেন, তাঁদের প্রতি হিন্দুদের ভদ্র আচরণ করা উচিত।

প্রশ্ন - ১০৪ হিন্দুর পক্ষে কোন্ পেশা সবচেয়ে উপযোগী?

উত্তর : যে কোনও পেশার কাজ যদি যথাসাধ্য সৎভাবে ও আন্তরিকভাবে করা হয়, সে কাজ সম্মানজনক। তবে ঈশ্বর কায়িক শ্রমে জীবন নির্বাহকারী ও ব্যবসায়িক উদ্যোগই বেশি পছন্দ করেন, কারণ শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা সম্পদ সৃষ্টি করেন এবং সেই সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা রেখে যান।

প্রশ্ন - ১০৫ হিন্দুধর্মের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য কোন্ সম্প্রদায়ের অবদান সর্বাধিক?

উত্তর : ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন এবং আর্থিকভাবে তাদেরকে সচ্ছল দেখলে খুশি হন। শ্রমজীবী এবং কারিগরদের দান সর্বাধিক, উদ্যোগপতিরা দ্বিতীয় স্থানে, বিদ্বজ্জন এবং রাজনীতিকেরা তৃতীয়, অন্য সব পেশা চতুর্থ। তবে ধনবণ্টন অর্থনীতিতে অবদান অনুসারে হয়নি। হিন্দুর মধ্যে সমাজগঠনে পরিবর্তন আনা দরকার।

প্রশ্ন - ১০৬ বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কি কোনও বিরোধ আছে?

উত্তর : বিজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভৌতিক, জৈবিক, রাসায়নিক স্তরে ব্যাখ্যা করে এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরের বিশ্বকে আরও উন্নত করে তোলে। বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মে কোনও বিভেদ নেই। মত

বিরোধ তখনই হয় যখন কোনও ভণ্ড সাধু প্রচার করেন যে তিনি ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ, কথোপকথন ইত্যাদি করতে সক্ষম।

ঈশ্বরের কোনো আকার, রঙ, বিবরণ নেই — সুতরাং তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব নয়। যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। ভণ্ডরা চায় না মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে তাদের ভণ্ডামি ধরে ফেলুক। তারা খোলাখুলি আলোচনা বন্ধ করার জন্য নানারকম যুক্তির ফাঁকি তৈরি করে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম বিজ্ঞানের ধারক, বাহক এবং সমর্থক। যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা ধর্ম বলে মানা উচিত নয়।

প্রশ্ন - ১০৭ মনুষ্যজাতি কে সৃষ্টি করেছে এবং আদিম মানুষ কীভাবে বাস করত?

উত্তর : হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী বিবর্তনের মাধ্যমে মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে এসেছে, কয়েক কোটি বছর আগে। আদিম মানুষের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান ছিল না, ধারণা ছিল না আবর্তন সর্ম্পকে। তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে আদিম জীবন যাপন করত। তারা পশুশিকার করে, ফল পেড়ে, অন্যের খাবার এবং সম্পদ ছিনিয়ে অন্য গোষ্ঠীর মহিলাদের দখল করে নৃশংস জীবনযাপন করত। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী দশ অবতার চক্রের মাধ্যমে মানবের ক্রম বিবর্তন হচ্ছে। মানুষ প্রথমে জলজ প্রাণী মৎস অবতার, ধীরে ধীরে ডাঙ্গায় জন্তুজীবন অর্থাৎ বরাহ অবতার, পরে কৃষির মাধ্যমে সভ্য জীবনের অস্তিত্ব দেখা যায় রামঅবতারে, আধুনিক মানবজীবনের সম্যক উপলব্ধি পাওয়া যায় কৃষ্ণ অবতারের মধ্যে।

প্রশ্ন - ১০৮ ঈশ্বর কখন মনুষ্যজাতিকে উদ্ধার করতে এলেন?

উত্তর : ঈশ্বর সৃষ্টির প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তবে মানুষ তার অজ্ঞতার জন্য তাঁকে জানতে পারেনি। ঈশ্বর অনেক প্রবর্তক পাঠিয়েছেন, কিন্তু তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কার্যকরী হননি। কারণ যোগাযোগ করার জন্য কোনও ভাষা ছিল না। তাছাড়া তখনকার দিনের আদিবাসীরা ছিল দুর্ধর্ষ এবং ভয়ানক। তারা তাদের দলনেতা ছাড়া কাউকে মানত না। তাদের ভয় ছিল প্রাকৃতিক

দুর্যোগের-রোগের-ভয়ানক জন্তুজানোয়ারের এবং অন্য দল বা আদিবাসী গোষ্ঠীর। তারা ভাবত যদি তাদের প্রিয় খাবার ত্যাগ করা হয় বা বলিদান করা হয় তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে তারা রক্ষা পাবে। তারা ভাবত ভগবান হলেন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোনও রাজা বা দলীয় সর্দার এবং এইরূপ মিথ্যা ভগবান তার সব অনুসারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ আনুগত্য দাবি করবেন এবং নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কোনও স্বাধীন আলোচনা বরদাস্ত করবেন না। তাই ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য প্রকাশিত হত না। আসলে ঈশ্বর এইসব ক্ষুদ্র স্বার্থের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার। ঈশ্বর অনেক মহান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রথম মানবজাতিকে জীবনযাত্রার ঈশ্বরীয় ধর্মপথ দেখালেন। ঐ ত্রয়ীই মানবসমাজের প্রথম ধর্মপ্রবর্তক এবং এদের মাধ্যমেই মানব জাতির প্রথম ঐশ্বরিক ত্রাণের সন্ধান পেল।

প্রশ্ন - ১০৯ মৃত্যুর পরে বিষয়সম্পত্তি আইনগত প্রাপকদের মধ্যে কীভাবে বণ্টন করা হবে ?

উত্তর : সমস্ত সম্পদের সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক হলেন ঈশ্বর। মানুষ তার বুদ্ধিবলে এবং বিজ্ঞানের কৌশলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অর্থ বৃদ্ধি করে। সেজন্য তার মৃত্যুর পরে তার বংশধরদের সম্পদের ওপর অধিকার থাকলেও তা সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পরে তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পাবে তার সহধর্মিনী। তারও মৃত্যু হলে সেই সম্পত্তি পাবে তার সন্তানেরা। এমনভাবে তা ভাগ হবে যাতে সম্পত্তির বিভাজনে কোনও অর্থনৈতিক অপব্যবহার না হয়। সাধারণত বাড়িঘর যা এক জায়গা থেকে আর আর এক জায়গায় নেওয়া যায় না, তা ছেলেরা পাবে এবং অর্থ, গহনা ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি মেয়েরা পাবে।

মেয়েদের বিবাহের পর তারা অন্য পরিবারের অংশভুক্ত হন, কিন্তু তারা যদি অবিবাহিত থাকেন বা বৈধব্য লাভ করেন তাহলে তাঁরা স্থাবর সম্পত্তির সমান ভাগ পাবেন। যদি সমতা রাখা সম্ভব না হয় তাহলে স্থাবর সম্পত্তির মূল্যমান বণ্টনের মাধ্যমে করতে হবে। এই বণ্টন সুষম

হওয়ার পর সম্পত্তি ভাগ করা যাবে। মেয়েদের অর্থ দেওয়া হবে বিষয় হস্তান্তরিত হবার আগে। সমস্ত রকম বিতর্ক এড়াতে বণ্টনের কাজে সমাজের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। পরিবারের কোনও সদস্য যদি তার অংশ বিক্রি করতে চান তাহলে প্রথমে বর্তমান অংশীদারদের সেই অংশ কেনার সুযোগ দিতে হবে।

সবশেষে দেশের আইন হল সর্বোচ্চ সংস্থা যা সব বিষয়সম্পত্তির বিতর্কের সমাধান করবে।

প্রশ্ন - ১১০ কী করে সৎ ও ভালো হিন্দু হওয়া যায়?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি সৎ ও ভালো হিন্দু হতে চান তাহলে তাঁকে হিন্দুধর্মের মৌলিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং শপথ নিতে হবে যে : (১) স্ত্রী-পুরুষ সবাই সমান ভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসা পায়। জীবন ভোগ করার অধিকার সবার সমান। (২) ঈশ্বর পৃথিবীর সব মানুষ, সমস্ত জীব এবং প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। (৩) কোনও মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁচতে পারে না। (৪) ঈশ্বর সব মানুষকে হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি এবং বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন, যাতে তারা এর দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। মানুষ ইহজগতে সৎভাবে ও সহানুভূতিশীল হয়ে সুস্থ জীবনযাপন করলে পরম তৃপ্তিসহ জীবন ভোগ করতে পারেন এবং ঈশ্বর মানুষের পাপ এবং কুকর্মের জন্য দায়ী নন। (৫) প্রত্যেকের উচিত সকালে ও সন্ধ্যায় প্রতিদিন দু-বার করে অন্তত পনেরোটি মন্ত্র উচ্চারণ করা, প্রতিদিন একবার দশ মিনিটের জন্য প্রাণায়াম করা এবং মাসে একবার ভোজ-উৎসবে যোগদান করা (ভোজ উৎসব হল পূর্ণিমার দিন দিবাকালে উপবাসের পর সন্ধ্যায় সকলে মিলিত হয়ে ভোজন আনন্দ উৎসব করা)। (৬) সৎকর্মে সাহসী হতে হবে — ভীরুতাকে ঘৃণা করতে হবে। (৭) যখন জীবনের কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হবে গীতা এবং বেদ পাঠের মধ্যে তার সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

বৈদিক হিন্দুধর্ম

বেদ কোনও পাপ স্বীকার করে না, শুধুমাত্র ভ্রান্তিকে স্বীকার করে এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো ভ্রান্তি, বেদের মতে, নিজেকে দুর্বল ও সর্বকালের পাপী মনে করা।

পৃথিবীতে যত ধর্মের কথা জানা যায় বৈদিক ধর্ম অথবা বেদে প্রতিপাদিত ধর্ম তার মধ্যে প্রাচীনতম স্তরের ধর্ম-চর্চা। ভারতে ১৮০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে বেদের আবৃত্তি চলে আসছে। এই ধর্ম প্রায় ২০,০০০ বৎসর প্রাচীন, সভ্য জগতে এই বেদ কথিত ধর্ম থেকেই সকল ধর্মের সূত্রপাত। বেদ ভিত্তিক এই ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, পরবর্তীকালে এর নাম হয় হিন্দুধর্ম অথবা বৈদিক হিন্দুধর্ম। আদিতে এর নাম ছিল সনাতন ধর্ম অর্থাৎ চিরাচরিত জীবনপন্থা।

৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সনাতন ধর্ম অবিঘ্নিত ছিল। আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আগত বিদেশী অশ্বারোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারা ভারতীয়দের বলত হিন্দু অর্থাৎ সিন্ধুনদের তীরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতা। শাসকদের প্রদত্ত নামটি স্থায়ী হয়ে গেল এবং সনাতন ধর্ম কালক্রমে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত হল।

'সনাতন'-এর অর্থ নিত্য, চিরন্তন; 'ধর্ম'-এর অর্থ মানবিকতাবাদী সৎজীবনে বিশ্বাস। এই বিদেশীদের দ্বারা ভারত আক্রমণের সময় থেকে কলিযুগ আরম্ভ হয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কারণে। কলিযুগে বেদ সে-গুরুত্ব হারায় এবং আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত স্তোত্রগুলির অন্তর্ভুক্তির কারণে কিয়ৎপরিমাণে অশুদ্ধ হয়ে যায়।

বৈদিক ধর্ম ভারতকে তার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং অতি উচ্চ মানবিক মূল্যবোধ ও সর্বজীবের প্রতি মমত্ববোধ দান করে। বেদের শক্তি নিহিত তার অলৌকিক ক্ষমতার মধ্যে।

যাঁরা নিয়মিত বেদ আবৃত্তি করেন তাঁদের পরিবার ও স্বজনবর্গের ব্যাধির নিরাময় হয়, তাঁদের ঘিরে এক অদৃশ্য ঐশ্বরিক নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টি হয়। আজ এখনপর্যন্ত অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

প্রকাশ্য স্থানে বহুজনের একত্রে বেদ আবৃত্তি বহুবার মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে জীবনদান করেছে। হিন্দুদের বিশ্বাস, নিয়মিত বেদ আবৃত্তি এবং বেদের উক্তি পালন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য ও শান্তি দান করে।

বৈদিক ধর্মের পতন ঘটে যখন আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এশিয়া মাইনর, ইউরোপ এবং পারস্য থেকে আক্রমণকারীরা সিন্ধুনদের উজানের অববাহিকা আক্রমণ করে। ইরানের ধর্মের ওপর বেদের প্রভাব জরথুস্ত্রীয়দের অপেক্ষাও প্রাচীন, সেই কারণে তাদের দর্শনের সঙ্গে বৈদিক ভারতের ধর্মের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

মূল বেদসমূহ ছিল একেশ্বরবাদী, বলপূর্বক তার সঙ্গে ইরানের সূর্য পূজা, ইন্দ্র পূজা এবং পশুবলির প্রথার মিশ্রণ ঘটানো হয়। ধার্মিক ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদানের ফলে বিদেশীরা ভারতের স্বর্ণভাণ্ডারের এবং ঐশ্বর্যের হদিশ পায় এবং তারা আক্রমণকারীরূপে ভারতে আগমন করে। ভারতে এসে তারা তাদের ধর্ম ও লোকাচার স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের তারা সামাজিক ও মানসিকভাবে ধর্ষণ করে বিকলাঙ্গ করে দেয়, দমন করে। ভারতীয়েরা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত অহিংস ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস রাখে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয়রা শৃঙ্খলাবোধ, সমরবিদ্যা এবং আত্মরক্ষাকে কোনও দিন গুরুত্ব দেয়নি। তার ফলে ভারতীয়েরা সর্বদাই দুর্বল থেকে গেছে, আক্রমণের শিকার হয়েছে। পুরাকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় একশত বিষয়ে শিক্ষাদান হত, কিন্তু সমর বিদ্যায় কোন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

বেদের অবশিষ্ট এখন যা আছে তা হল বেদ এর ওপর লেখা দেশী বিদেশীদের রচনাসমূহ। এইসব লেখা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সুদীর্ঘ বিবরণ বেদের উৎপত্তি সংক্রান্ত। বেদের স্তোত্রসমূহ ঈশ্বর প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দিয়েছিলেন এবং এ-বিষয়ে সকলে একমত যে ঋষিদের নিকট সেগুলিকে প্রকট করা হয়েছিল শত সহস্র বছর ধরে। বেদ মুখস্থ করে ঋষিগণ তা স্মৃতিতে রাখতেন। বেদের আধিপত্য ছিল ১৮০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, তারপরে হঠাৎ এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আজ আমরা যে বেদ পাই, জার্মান এবং ব্রিটিশদের লিখিত এবং তাতে শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানের কথা আছে। মূল বেদ এখনও কিছু ঋষিগণ নিজেদের কাছে ধরে রেখেছেন।

বৈদিক বিদ্যালয়গুলির উত্থান ও পতনের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না; প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কয়েক শত বৈদিক বিদ্যালয়ের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কয়েকটি ছাড়া সেগুলির কথা কিছু জানা যায় না। শুধুমাত্র কয়েকটির কিছু তথাকথিত রচনা অবশিষ্ট আছে, যেমন ঐতরেয় ও সাংখ্যায়ন, ঋগ্বেদ এবং অপস্তম্ব এবং যর্জুবেদীয় ধারা ইত্যাদি।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রচনাগুলিই তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক মূল্যবান। সেগুলি হল চারটি সংহিতা, যাকে বলা হয় বেদ। ব্যাপকতর অর্থে বেদ বলতে পরবর্তী রচনার সমগ্র ও অংশবিশেষও বোঝায়, কারণ সেগুলির ভিত্তি ছিল চারটি সংহিতার কোনো একটি। চারটি বেদের নাম ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ ।

ঋগ্‌বেদ 'কাব্যের বেদ', সংহিতাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। তার প্রায় ১০০০ স্তোত্র ঈশ্বর নিবেদিত, এবং 'ওঁ' দ্বারা চিহ্নিত। অধিকাংশ স্তোত্র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এক ঈশ্বরের কথাই বলে; কিন্তু সাধারণভাবে আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদূর, ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন ধারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করবার জন্যে রচিত।

সামবেদ অথবা মন্ত্রের বেদ প্রায় সমগ্রভাবেই ঋগ্‌বেদ থেকে আহৃত। সঙ্গীতের স্বরলিপি সহযোগে, ঈশ্বরের বাণী আকর্ষণীয় ও প্রীতিপ্রদভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত।

যজুর্বেদ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মন্ত্রাদির সম্পর্কিত, পরে যজুর্বেদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঈষা-উপনিষদ রচিত হয়।

অথর্ববেদের বিষয় প্রধানত ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহ এবং বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান ।

কালানুক্রমিক ধারায় এর পাঠ সম্ভবত 'ব্রাহ্মণ'-এর টীকাসমূহ। 'ব্রাহ্মণ' কোনো বর্ণের সম্পর্কিত নয়। এটি একটি গ্রন্থর নাম। সেগুলি আবৃত্তির উদ্দেশ্যে রচিত। এগুলি গদ্যরচনা, বিভিন্ন বেদ থেকে সংকলিত, বিভিন্ন বেদের সূত্রগুলি এবং আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা হিসাবে রচিত।

'আরণ্যক'-গুলি ১২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত। সেগুলো লোকালয় থেকে দূরে অরণ্যের নিরালায় অধ্যয়ন করতে হত আরণ্যকগুলির নিগূঢ়, অতিপ্রাকৃত চরিত্র অনুধাবন করার জন্য। সেগুলির মধ্যে প্রধানত আছে বিভিন্ন খণ্ড ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতীকী ব্যাখ্যা। সব শেষে, সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপনিষদসমূহ ১৬,০০০-১০০০

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়ের মধ্যে রচিত। সর্বসাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক কাহিনী ও কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে প্রদত্ত দার্শনিক চিন্তার সংক্ষিপ্তসার সমন্বিত এই উপনিষদসমূহ। বৈদিক উপনিষদসমূহ সংখ্যায় তেরো।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদসমূহকে 'শ্রুতি' নামে অভিহিত করা হয়। তার অর্থ রচনাগুলি দৈব-প্রেরিত শ্রুত অংশ। আশ্চর্যের বিষয়, বেদের আবৃত্তি অলৌকিক ক্ষমতা দান করে, আজ পর্যন্ত যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও এক হাজার বৎসরের অধিক কাল ভারতবাসী বিদেশী বিধর্মী শাসনের অধীন ছিল, বৈদিক ভারত সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী থেকে গেছে। অন্য অনেক দেশ আক্রমণকারীদের ধর্মের চাপ সহ্য করতে না পেরে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বেদের শিক্ষা ভারতবাসীদের অবিচল থাকার ঐশ্বরিক বল দান করেছে। কৌতূহলী ব্যক্তিদের পাঠ, উপলব্ধি ও আবৃত্তির জন্যে কিছু উপযোগী বৈদিক স্তোত্র পরিবেশিত হল।

বেদের শ্লোক

वेदोऽखिलो-धर्ममूलम् ॥1॥

বেদ অখিলো - ধর্মমূলম্ ।

বেদ-সমূহ নিখিল বিশ্বের সকল ধর্মের মূল।

मधु मे जिहवायां दधातु परमेश्वर ।
येनाऽहं सर्वप्रिय: सर्वजनेभ्य: भूयासम् ॥2॥

মধু মে জিহ্বায়াং দধাতু পরমেশ্বর
যেনাহং সর্বপ্রিয়ঃ সর্বজনেভ্যঃ ভূয়াসম্।

আলোকের দেবতা ! আমাকে মধুর মিষ্টত্বে পূর্ণ করো, যেন আমি জনসমষ্টিকে বেদের অপরূপ বাণী শোনাতে পারি।

नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।
किमावरीव: कुह कस्य शर्मन्नम्भ: किमासीद् गहनं गभीरम् ॥
न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्रया अह्न आसीत् प्रकेत: ।
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर: किं चनास: ॥
तम: आसीत् तमसा गूळहमग्रे ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम् ।
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम् ॥3॥

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্ ।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্রয়া অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাসঃ ।
তমঃ আসীৎ তমসা গূহ্যমগ্রে অপ্রকেতম্ সলিলং সর্বমা ইদম্ ।
তুচ্ছয়েনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্।

সেই সময়ে অস্তিত্ব ছিল না, অনস্তিত্ব ছিল না। বায়ু ছিল না, আকাশ ছিল না, অতল গভীর জলরাশি ছিল না, মৃত্যু ছিল না, অমরত্ব ছিল না, দিবস ছিল না, রাত্রি ছিল না। একমাত্র সেই পুরুষ ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সমস্ত কিছু অন্ধকার ও শূন্য ছিল। পরে বায়বীয় বস্তুতে আচ্ছন্ন হল। তারপরে সৃষ্টি হল অবিচ্ছিন্ন জলরাশি। সেই পুরুষ উত্থিত হলেন, যিনি সর্বশক্তিমান।

यत्राग्निश्चन्द्रमा: सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यर्पिता:
स्कम्भं तं ब्रूहि कतम: स्विदेव स:
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिता ॥4॥

যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যর্পিতাঃ
স্কম্ভং তম্ ব্রুহি কতমঃ স্বিদেব সঃ
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবা অঙ্গে সর্বে সমাহিতা।

বিশ্বকে কে ধারণ করে আছেন? কে সেই একমাত্র পুরুষ যার ওপরে অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য এবং বাত স্থিত? ঈশ্বরের প্রতিফলিত মহিমার মধ্যে নিহিত সর্ব দেবতা, তাঁর প্রকাশের বৈচিত্র্য স্বরূপ।

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैरावृतम् ।
तस्मिन् यद् यक्षमात्मवत् तद् वै ब्रह्मविदो विदु: ॥5॥

পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভির্গুণৈরাবৃতম্
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মবৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।

মানুষের দেহ যেন নবদল পদ্ম, এর নয়টি নির্গমদ্বার। সত্য, রজ ও তম তিনগুণ। বেদাধ্যয়নকারীগণ সে-বিষয়ে অবগত। এই তিন গুণ সব মানুষের মধ্যে অল্পবিস্তর রয়েছে। বক্ষের মধ্যে পদ্মের মত রয়েছে হৃদয়, ওখানেই ঈশ্বর বাস করেন।

ईश्वर: परमैकस्वरूप: ॥
स नित्य:सर्वव्यापी विभुरनादिरनन्तश्च स निराकारो निरूपो वर्णनातीतो निष्कम्पश्च ।
क्कचित् शब्दरूपेण स आत्मानं प्रकाशयति स विधाता
कारणानां कारणं तथा सर्वशक्तिमान् तदिच्छापुरणाय कस्यापि सहायस्य प्रयोजनं न वर्तते
यतो द्वितीय: कोऽपि नास्ति ॥6॥

ঈশ্বরঃ পরমৈকস্বরূপঃ
স নিত্যঃ সর্বব্যাপী বিভুরনাদিরনন্তশ্চ স নিরাকারো নিরূপো বর্ণনাতীতো নিষ্কম্পশ্চ ।
ক্বচিৎ শব্দরূপেণ স আত্মানং প্রকাশয়তি স বিধাতা
কারণানাং কারণং তথা সর্বশক্তিমান্ তদিচ্ছাপুরণায় কস্যাপি সহায়স্য প্রয়োজনং ন বর্ততে ।
যতো দ্বিতীয়ঃ কোঅপি নাস্তি।

ঈশ্বরই একমাত্র পরমপুরুষ। তিনি সর্বাতীত, সর্বব্যাপী, অনাদি-অনন্ত, তাঁর আদিও নেই, অন্তও নেই। তাঁর রূপ নেই, বর্ণ নেই, তিনি অবর্ণনীয়। কখনও কম্পন, কখনও বাক্যরূপে, তিনি ব্যক্ত হন। তিনি স্রষ্টা, সমস্ত কারণের কারণ। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্যে অধীনস্থ কোনও সহকারীর তাঁর প্রয়োজন নেই।

केचित् तत्सायुज्यं लभन्ते, केचिच्च विरहेण वियुज्यन्ते ।
तस्येच्छया सर्व घटते, तेन विना कः कार्यकरणे समर्थः ? ॥7॥

কেচিৎ তৎসাযুজ্যং লভন্তে, কেচিচ্চ বিরহেণ বিযুজ্যন্তে।
তস্যেচ্ছয়া সর্ব ঘটতে, তেন বিনা কঃ কার্যকরণে সমর্থঃ ?

কেউ কেউ তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করেন, কেউ অজ্ঞানতার মধ্যে জীবন বাহিত করেই বিদায় গ্রহণ করেন। তাকে উপলব্ধির চেষ্টা থাকলে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। অপর কেউ কী করতে পারে ?

स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो
ब्रह्माभयं वै ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥8॥

স বা এষ মহানজ আত্মাঅজরোঅমরোঅমৃতোঅভয়ো
ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ।

আত্মা নিরাকাঙ্ক্ষ, তাঁর কোনও অভাব নেই। তাঁর মৃত্যুভয় নেই। আত্মার বয়স হয় না, তিনি মৃত্যুহীন, চিরযৌবনের অধিকারী। যিনি এর উপলব্ধি করেছেন, তিনি নির্ভীক সাহসী হবেন।

एक एवास्ति नापरो विश्वभुवनस्य स्रष्ढा ।
पालयिता च संहर्त्ताच पुनरपि सृजनाय तत्
एतदेव दिव्यत्वमीशस्य भास्वत् वर्चसममेयम् ॥9॥

এক এবাস্তি নাপরো বিশ্বভুবনস্য স্রষ্টা
পালয়িতা চ সংহর্ত্তাচ পুনরপি সৃজনায় তৎ ।
এতদেব দিব্যত্বমীশস্য ভাস্বৎ বর্চসমমেয়ম্।

একমাত্র ঈশ্বরই সেই পুরুষ যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং সময়ে বিশ্বকে বিনাশ করেন, পুনরায় নতুন এক বিশ্ব সৃষ্টি করার জন্যে। তিনিই সর্ব কর্তৃত্বময় ঈশ্বর।

ईश्वरस्तस्यैव दूतरूपेण पृथिव्यां प्रेरयति देवान्
तस्माच्च प्रभवति मङ्गलं समासेनेह मनुष्यमंडले ॥10॥

ঈশ্বরস্তস্যৈব দূতরূপেণ পৃথিব্যাং প্রেরয়তি দেবান্ ।
তস্মাচ্চ প্রভবতি মঙ্গলং সমাসেনেহ মনুষ্যমণ্ডলে।

ঈশ্বর মানবের মঙ্গলের জন্য বিশ্বের নানা স্থানে দূত হিসাবে মনুষ্যরূপী দেবতাদের প্রেরণ করেন। এই দেবতারা মানুষকে উন্নত ও মানবিক জীবন যাপনে পথ দেখান।

यथाकामं वा उत्तिष्ठन् वा अनन्यमनसा स्तूयमानश्च भगवन्तम्
सायं प्रातश्च स्व-समाजेन सार्द्धम्
प्रार्थनां कुर्वीताहर्निशं भगवत्-सकाशम् ॥
प्रार्थनया क्षीयते सर्वपापं प्राप्स्यते च स्वर्गम्
भुयिष्ठं परिमार्जनेन लौहमलं यथा प्रयाति
अयश्च भवति परिशुद्धम् ॥11॥

যথাকামং বা উত্তিষ্ঠন্ বা অনন্যমনসা স্তূয়মানশ্চ ভগবন্তম্
সায়ং প্রাতশ্চ স্ব-সমাজেন সার্দ্ধম্ ।
প্রার্থনাং কুর্বীতাহর্নিশং ভগবৎ-সকাশম্
প্রার্থনয়া ক্ষীয়তে সর্বপাপং প্রাপ্স্যতে চ স্বর্গম্
ভূয়িষ্ঠং পরিমার্জনেন লৌহমলং যথা প্রয়াতি
অযশ্চ ভবতি পরিশুদ্ধম্।

প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে স্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে দণ্ডায়মান অবস্থায় অনন্যমনে ঈশ্বরের প্রশস্তি উচ্চারণ করা উচিত। এই প্রশস্তিই স্বর্গলাভের উপায়, যেমন পরিমার্জনায় মরিচা দূর হয়, প্রার্থনায় পাপ ধৌত হয়ে যায়।

सर्वेऽत्र जन्मना अमृतस्य पुत्रा अपापविद्धाश्च ते ।
क्वचित् कल्मषं च कृत्वा केचिदात्मानं क्लेदयन्ति ॥12॥

সর্বেঽত্র জন্মনা অমৃতস্য পুত্রা অপাপবিদ্ধাশ্চ তে
ক্বচিৎ কল্মষং চ কৃত্বা কেচিদাত্মানং ক্লেদয়ন্তি।

জীবমাত্রেই নিষ্পাপ অবস্থায় অমৃতপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার মৌলিক শুদ্ধতা জীবিতাবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকে, যদিও সাময়িকভাবে নিজের কর্মের ফলে মালিন্য তাকে গ্রাস করে।

उच्चो वा नीची वा न कोऽपि जनः ।
न च नितरां पापकृन् न वा पवित्रस्वरूपः ॥
ईश्वरकरुणया कश्चित् महत्वं लभते ।
तदिच्छया ऋद्धश्च जायते कश्चित्, श्रमेण तु कश्चिदभ्येति पदमुन्नतम् ॥13॥

উচ্চো বা নীচী বা ন কো অপি জনঃ
ন চ নিতরাং পাপকৃন্ ন বা পবিত্রস্বরূপঃ
ঈশ্বর করুণয়া কশ্চিৎ মহত্বং লভতে।
তদিচ্ছয়া ঋদ্ধশ্চ জায়তে কশ্চিৎ, শ্রমেন তু কশ্চিদভ্যেতি পদমুন্নতম্।

কোনও মানুষ উঁচু নয়, কেউ নীচু নয়, কোনও মানুষ ঘৃণিত পাপী নয়, কেউ পুণ্যাত্মা নয়। পরিশ্রমের দ্বারা ঈশ্বরের করুণায় মহত্ত্বলাভ হয়। তাঁর কৃপায় কেউ জন্মসূত্রেই উন্নতিলাভ করে, কাউকে সেই উন্নতি সাধনের জন্য পরিশ্রম করতে হয়।

यत्र यत्र मे मनो गच्छति दृश्यते प्रभुम् ।
तस्य कृपां विना न कोऽपि मुक्तिमर्हति ॥14॥

যত্র যত্র মে মনো গচ্ছতি দৃশ্যতে প্রভুম্
তস্য কৃপাং বিনা ন কোঅপি মুক্তিমর্হতি।

যে-দিকেই দৃষ্টিপাত করি ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখতে পাই। তাঁর করুণা ব্যতিরেকে কোনও কর্মই সাফল্যলাভ করে না।

अक्लेशेन वै सम्भवति ईश्वरस्य गुणकीर्तनम्
तद् गुणानांच निरूपणं तु क्लेशकरमेव प्रतीयते ।
गुरोः कृपया एव तज् ज्ञानमेवाधिगम्यते ॥15॥

অক্লেশেন বৈ সম্ভবতি ঈশ্বরস্য গুণকীর্তনম্
তদ্ গুণানাং চ নিরূপণং তু ক্লেশকরমেব প্রতীয়তে।
গুরোঃ কৃপয়া এব তজ্ জ্ঞানমেবাধিগম্যতে।

ঈশ্বরের গুণগান করা সহজ, তার রহস্যের গভীরতার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। গুরুর কৃপায় যদি অন্তরে তাঁর উপলব্ধি জন্মায়, ফললাভ সহজেই হয়।

वेनस्तत्पश्यन्विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।
यस्मिन्निदं सं च विचैति ओत:प्रोतश्व प्रजासु ॥16॥

বেনস্তৎপশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্
যস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি ওতঃপ্রোতশ্চ প্রজাসু।

যা-কিছু বিচরণ করে, যা-কিছু স্থির হয়ে থাকে, যা হাঁটে, যা সাঁতার দেয়, যা ওড়ে, সেই সকলেরই প্রভু, এই ঈশ্বর। ঈশ্বর দ্বারাই বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ, তাঁর থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি।

अमोघाशिषस्तस्मिन्नेव सदैव सन्ति परमेश्वरस्य ।
यो जानाति दु:खत्रयजर्जरो मनुष्येह संसारे ॥
स एव ज्ञातुमर्हति दु:खत्रयस्य हेतवश्च परा-निवृत्तेरुपायश्च तस्य
स वै विजानाति संसारसागरस्य गहनं रहस्यम् ॥17॥

অমোঘাশীষস্তস্মিন্নেব সদৈব সন্তি পরমেশ্বরস্য ।
যো জানাতি দুঃখত্রয়জর্জরো মনুষ্যেহ সংসারে।
স এব জ্ঞাতুমর্হতি দুঃখত্রয়স্য হেতবশ্চ পরা-নিবৃত্তেরুপায়শ্চ তস্য
স বৈ বিজানাতি সংসারসাগরস্য গহনং রহস্যম্।

ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করেন, যিনি দুঃখের অস্তিত্ব, তার হেতু ও তার অবসানের পথ উপলব্ধি করেন। পার্থিব জীবন যাপনের যথার্থ পথ তিনি জ্ঞাত হয়েছেন ।

वेदपठनं, पुरोहितेभ्यो दानं, यज्ञस्तापशीतादिकैरात्मपीड़नम्
अमृतत्त्वलाभाय तपश्चरणमित्यादिकं मोहग्रस्तं परिशुद्धं न करोति ॥18॥

বেদপঠনং, পুরোহিতেভ্যো দানং, যজ্ঞস্তাপশীতাদিকৈরাত্মপীড়নম্
অমৃতত্ত্বলাভায় তপশ্চরণমিত্যাদিকং মোহগ্রস্তং পরিশুদ্ধং ন করোতি।

যার মনের ক্লেদ দূর হয়নি, বেদ অধ্যয়ন, পুরোহিতকে অর্ঘ্যদান, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, তাপ ও শৈত্যের দ্বারা আত্মনিপীড়ন এবং অমরত্ব লাভের উদ্দেশ্য আরও ওই জাতীয় বহু কৃচ্ছ্রসাধন তাঁকে শুদ্ধতা দান করে না।

श्रद्धया पूजितो वै ईश्वरोस्मत्प्रार्थनां पूरयति ।
हे प्रियतम! तवैव सुरक्षाश्रितानां श्रुभैषणां च गृहाण ॥19॥

শ্রদ্ধয়া পূজিতো বৈ ঈশ্বরোস্মৎপ্রার্থনাং পূরয়তি
হে প্রিয়তম ! তবৈব সুরক্ষাশ্রিতানাম্ শ্রুভৈষণাং চ গৃহাণ।

শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের পূজা করলে, ঈশ্বর ভক্তের প্রত্যেকটি পূজা গ্রহণ করেন। হে প্রিয়তম, ঈশ্বর, ভক্তের সকল সদিচ্ছা গ্রহণ করুন।

अन्तश्चारन्ति मनसि कामास्तेभ्यो उदितानि
सर्वाणि त्तेष्टितानि कर्माणि इहलोके ॥
एतान् कामान् विलोक्यते विधात्रा ईशलोके
नराणां शुभाशुभ-कर्मफल-विधानकाले ॥
तीक्ष्णभाषणरताश्च ये, ये चातिदर्पपरायणाः
तेषाम् कृते स्वर्गी भवति पराङ्मुखः सर्वदा ॥20॥

অন্তশ্চরন্তি মনসি কামাস্তেভ্যো উদিতানি
সর্বাণি ত্তেশ্টিতানি কর্মাণি ইহলোকে
এতান কামান্ বিলোক্যতে বিধাত্রা ইশলোকে
নরাণাং শুভাশুভ-কর্মফল-বিধানকালে
তীক্ষ্ণভাষণরতাশ্চ যে, যে চাতিদর্পপরায়ণাঃ
তেষাম্ কৃতে স্বর্গী ভবতি পরাঙ্মুখঃ সর্বদা।

ঈশ্বরের রাজত্বে সকল কর্মের বিচার হয় মনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিবেচনায়। যে আত্মম্ভরী, যে কথা বার্তায় উগ্র, সে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারে না।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुधा श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥21॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।

ঈশ্বরকে যুক্তির দ্বারা লাভ করা যায় না। যুগযুগান্তের যুক্তি প্রয়োগেও তিনি লভ্য নন। বিশ্বাস ও ভালোবাসা দ্বারা তিনি সহজলভ্য।

शुभेषणा सत्यमक्रोधश्च शुद्धता सत्यवादिता
प्रेम-दयादयो गुणैरन्विताश्च ये जनाः ईश्वरस्तेषां प्रसीदति ॥22॥

শুভেষণা সত্যমক্রোধশ্চ শুদ্ধতা সত্যবাদিতা

প্রেম-দয়াদয়ো গুণৈরন্বিতাশ্চ যে জনাঃ ঈশ্বরস্তেষাং প্রসীদতি।

সদিচ্ছা, প্রেম, শুদ্ধতা, সত্যবাদিতা ও দয়াগুণ যাঁর চরিত্রে বিদ্যমান, ঈশ্বর তাঁকে পছন্দ করেন।

यावन्नैव आस्था ईश्वरे भवति पूर्णा
तावन्नाकपृष्ठं च भवति सुदुस्तरम्
सा आस्था च तावन्न याति पूर्णतां यावदास्तिकेषु न जायते प्रीतिः ॥23॥

যাবন্নৈব আস্থা ঈশ্বর ভবতি পূর্ণা

তাবন্নাকপৃষ্ঠং চ ভবতি সুদুস্তরম্

সা আস্থা চ তাবন্ন যাতি পূর্ণতাং যাবদাস্তিকেষু ন জায়তে প্রীতিঃ।

বিশ্বাস না থাকলে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমার বিশ্বাস ততদিন সম্পূর্ণ হবে না, যতদিন না তুমি সকল ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের ভালবাসবে।

प्रतिनियतं प्रार्थनां कुर्वीत सदा तदर्थभावनया सह ।
ततो वै दृश्वते भगवदुद्भासं भाग्यश्रीश्च भवति प्रसन्ना ॥24॥

প্রতিনিয়তং প্রার্থনাং কুর্বীত সদা তদর্থভাবনয়া সহ

ততো বৈ দৃশ্যতে ভগবদুদ্ভাসং ভাগ্যশ্রীশ্চ ভবতি প্রসন্না।

যে নিয়মিত প্রার্থনা অব্যাহত রাখে, তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, ঈশ্বরের জ্যোতি তার কাছে উন্মোচিত হয় ।

दर्शन-गणितशास्त्रपारगानां भगवत्-प्रेषितमहाजनानाम्
प्रतिवोधसुकरं तु भगवत्-सृष्टिरहस्यं गहनं गभीरम् ॥
यश्च यस्य धर्ममार्गस्ततः प्रतीपगमनमीश्वरस्यासहनीयम् ॥25॥

দর্শন-গণিতশাস্ত্রপারগানাং ভগবৎ-প্রেষিতমহাজনানাম্

প্রতিবোধসুকরং তু ভগবৎ-সৃষ্টিরহস্যং গহনং গভীরম্ ।

যশ্চ যস্য ধর্মমার্গস্ততঃ প্রতীপগমনমীশ্চরস্যাসহনীয়ম্।

দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও দেবগণ ঈশ্বরের সৃষ্টির গভীরত্ব উপলব্ধি সহজেই করতে পারেন। ধর্মের পথ থেকে কোনো চ্যুতি ঈশ্বর সহ্য করেন না।

पापरहितात्मा भूत्वा श्रद्धया सेवामहे ईश्वरं नित्यम् ।
महान् वै ईश्वरो धी-हीनानां धियं यः प्रचोदयति ॥
तद्वदिहलोके वर्त्तते यः प्राज्ञो धी-सम्पत्समृद्धः ।
स एव नयेत् सुपथा यावदल्पज्ञान् जनान् पृथिव्याम् ॥26॥

পাপরহিতাশ্চ ভূত্বা শ্রদ্ধয়া সেবামহে ঈশ্বরং নিত্যম্
মহান বৈ ঈশ্বরো ধি-হীনানাং ধিয়ং যঃ প্রচোদয়তি
তদ্বদিহলোকে বর্ত্ততে যঃ প্রাজ্ঞো ধী-সম্পৎসমৃদ্ধঃ
স এব নয়েৎ সুপথা যাবদল্পজ্ঞান্ জনান্ পৃথিব্যাম।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্তজনের মত আমি সেবাপরায়ণ। পাপমুক্ত হয়ে আমরা যেন ঈশ্বরের সেবা করতে পারি। ঈশ্বর অবহেলা ও বুদ্ধিবিকার দেখলে অপ্রসন্ন হন। মহান ঈশ্বর বুদ্ধিহীনের বুদ্ধি জাগ্রত করুন। জ্ঞানী ব্যক্তির উচিৎ ঈশ্বর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করার জন্য অল্প জ্ঞানী ব্যক্তিকে উজ্জীবিত করা।

ईश्वरस्य महद्दानं विवेको विद्यते नृणाम् ।
तस्मादधिकतरं समर्थसाधनमिष्टतरं वा न किंचनास्ति
तत्त्ववीधाय सम्यक् ॥27॥

ঈশ্বরস্য মহদ্দানং বিবেকো বিদ্যতে নৃণাম্
তস্মাদধিকতরং সমর্থসাধনমিষ্টতরং বা ন কিঞ্চনাস্তি
তত্ত্ববীধায় সম্যক্।

ঈশ্বর মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হিসেবে দিয়েছেন তার বিচারবুদ্ধি। বিচারবুদ্ধির চেয়ে সর্বাঙ্গ সুন্দর ও কাঙ্ক্ষনীয় আর কিছু নেই। বিচারবুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ বোঝে কোনটা সত্যপথ এবং কোনটা মিথ্যা।

नगत एव धरामेति, नगश्च प्रतिगच्छति ।
यद्दैवविहितं कर्म तत्तु साध्यं प्रयतत्तः ॥28॥

নগ্ন এব ধরামতি, নগ্নশ্চ প্রতিগচ্ছতি
যদ্দৈববিহিতং কর্ম তত্তু সাধ্যং প্রযত্নতঃ।

মানুষ পৃথিবীতে আসে নগ্ন হয়ে, বিদায়ও নেয় নগ্ন হয়ে। কর্ম করতে হবে, ঈশ্বর সৃষ্ট নিয়ম অনুযায়ী।

स एव सुखी सदैव यः स्वार्थपरतामत्येति सर्वशः
सत्यं तेनैव लब्धं शान्तिः शाश्वती तेनैव चाप्ता ॥29॥

স এব সুখী সদৈব যঃ স্বার্থপরতামত্যেতি সর্বশঃ
সত্যং তেনৈব লব্ধং শান্তিঃ শাশ্বতী তেনৈব চাপ্তা।

সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা যিনি জয় করেছেন, তিনিই সুখী হবেন, শান্তি লাভ করবেন, সত্যের সন্ধান পাবেন।

जीवनं यथाप्तं तमेव वरेण्यमिति विचिन्त्य
गतासूनां च पूरणशक्यं धर्मानुगं यस्य जीवितम् ।
जरया पीड्यमानोऽपि यस्तामभिनन्दति च
तेनैव लभ्यं भगवत्-प्रसादं दीर्धमायुश्चेति ध्रुवम् ॥30॥

জীবনং যথাপ্তং তমেব বরেণ্যমিতি বিচিন্ত্য
গতাসূনাং চ পূরণশক্যং ধর্মানুগং যস্য জীবিতম্ ।
জরয়া পীড্যমানোঅপি যস্তামভিনন্দতি চ
তেনৈব লভ্যং ভগবৎ-প্রসাদং দীর্ঘমায়ুশ্চেতি ধ্রুবম্।

জীবনকে কর্মময় করে নাও, বার্ধক্যকে স্বাগত করো, মৃত্যুকর্তৃক সৃষ্ট শূন্যতা পূর্ণ করতে নতুন প্রজন্মকে সাহায্য করো। ঈশ্বর তোমাদের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করবেন।

ये विश्वासनिर्वाहं कुर्वन्ति स्व-वचनात् कदापि न प्रविचलन्ति
ईश्वरनाम्ना कृतां प्रतिज्ञां निर्वाहयन्ति ते वै विश्वास-परायणाः ॥31॥

যে বিশ্বাসনির্বাহং কুর্বন্তি স্ব-বচনাৎ কদাপি ন প্রবিচলন্তি ।
ঈশ্বরনাম্না কৃতাং প্রতিজ্ঞাং নির্বাহয়ন্তি তে বৈ বিশ্বাস-পরায়ণাঃ।

তাঁরাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত যাঁরা ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেন, যাঁদের কথায় কোনো চ্যুতি হয় না, মানুষকেপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য জ্ঞানে পালন করেন।

प्रीतिं विना भगवद्भक्तेषु श्रद्धा नैव परिपूर्यति
श्रद्धां विना नूनं भवति स्वर्गः प्रवेशदुस्करः ॥32॥

প্রীতিং বিনা ভগবদ্ভক্তেষু শ্রদ্ধা নৈব পরিপূর্যতি
শ্রদ্ধাং বিনা নূনং ভবতি স্বর্গঃ প্রবেশদুস্করঃ।

ঈশ্বরকে ভক্তি না করলে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না, ঈশ্বরের সৃষ্ট সকলকে ভালো না বাসলে ভক্তি সম্পূর্ণ হবে না।

यदा सन्तोषमाप्नोति सत्कार्यीणि असत्कार्यीणि क्लिश्यति
तदैव हि भवेन्नरः सत्यं सत्यमीश्वरास्थितः ॥33॥

যদা সন্তোষমাপ্নোতি সৎকার্যীণ অসৎকার্যীণ ক্লিশ্যতি
তদৈব হি ভবেন্নরঃ সত্যং সত্যমীশ্বরাস্থিতঃ।

তোমার ভালো কাজ যখন তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার মন্দ কাজ যখন তোমাকে দুঃখিত করে, তখনই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ অনুগত ।

अन्नं यो ददाति बुभूक्षितेभ्यः पीडितानां भवति सहायकः
दुःखार्त्तान् समाश्लिष्यति तस्यैव ईशः प्रसीदति ॥34॥

অন্নং যো দদাতি বুভুক্ষিতেভ্যঃ পীড়িতানাং ভবতি সহায়কঃ
দুঃখার্ত্তান্ সমাশ্লিষ্যতি তস্যৈব ঈশঃ প্রসীদতি।

যখন তুমি একজন মানুষের হৃদয়কে আনন্দিত কর, বুভুক্ষকে অন্নদান কর, আর্তকে সাহায্য কর, পীড়িতের দুঃখ লাঘব কর, অত্যাচারিতের প্রতি কৃত অন্যায়ের অবসান কর, তখন ঈশ্বর প্রসন্ন হন।

क्षंन्तव्याः सर्वजीवाश्च नापि शप्तव्या अरातयश्च ।
एवं ये मन्यन्ते तेषां प्रसीदति केशवः ॥35॥

ক্ষন্তব্যাঃ সর্বজীবাশ্চ নাপি শপ্তব্যা অরাতয়শ্চ
এবং যে মন্যন্তে তেষাং প্রসীদতি কেশবঃ।

সর্বজীবে ক্ষমা করো, তোমার অপ্রিয়কে অভিশাপ দিও না। তাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হবেন ।

यद् ददाति दक्षिणहस्तेन तन्न वामो विजानीयात्
एवं समाचरेत् बुध एष ईशानुशासनम् ॥36॥

যদ্ দদাতি দক্ষিণহস্তেন তন্ন বামো বিজানীয়াৎ
এবং সমাচরেৎ বুধ এয ঈশানুশাসনম্।

ঈশ্বরের বিধানে সেই শ্রেষ্ঠ দান যা দক্ষিণহস্ত দেয়, বামহস্ত জানতে পারে না। আত্মশ্লাঘা ঈশ্বর সহ্য করেন না এবং দানের সমস্ত পূণ্য বিনাশ হয়।

परत्र प्रयाते नरे कर्म च तस्य नूनं विरमति इहलोके ।
तथापि तस्य त्राण-दान-जानप्रसारणादि सुकृतस्य कीर्त्त्या
सुचिरं जीवति स ह्रदयेषु जनानां प्रीत्या च तमनुचरंति जना: ॥
येन केन प्रकारेण को हि नाम नु जीवति ।
परेषामुपकारार्थं यज्जीवति स जीवति ॥37॥

পরত্র প্রয়াতে নরে কর্ম চ তস্য নূনং বিরমতি ইহলোকে।
তথাপি তস্য ত্রাণ-দান-জানপ্রসারণাদি সুকৃতস্য কীর্ত্ত্যা ।
সুচিরং জীবতি স হৃদয়েষু জনানাং প্রীত্যা চ তমনুচরংতি জনাঃ ।
যেন কেন প্রকারেণ কো হি নাম নু জীবতি ।
পরেষামুপকারার্থং যজ্জীবতি স জীবতি।

ঈশ্বরের রাজত্বে যখন কোনও মানুষের মৃত্যু হয়, তাঁর কর্মের অবসান হয় কিন্তু তাঁর দয়ার কথা তাকে অমর করে। জীবনে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আরও সুন্দর করে গঠনের চেষ্টা করে, অন্যকে সাহায্য করার জন্য যে জীবন যাপন করে, সে পুণ্যাত্মা।

ईश्वरसृष्टौ जगति क्रोधद्वेषौ दूरत: परिहर ।
यतो हि द्वावेतै मनुष्याणां सुकृतं ग्रसत: निर्मूलयतश्च
यथा अग्निरिन्धनं दहति भस्मीभूतं करोति च ॥38॥

ঈশ্বরসৃষ্টৌ জগতি ক্রোধদ্বেষৌ দূরতঃ পরিহর ।
যতো হি দ্বাবেতৈ মনুষ্যাণাং সুকৃতং গ্রসতঃ নির্মূলযতশ্চ
যথা অগ্নিরিন্ধনং দহতি ভস্মীভূতং করোতি চ।

ঈশ্বরের রাজত্বে ঈর্ষা ও ক্রোধ থেকে দূরে থাকো, কারণ ঈর্ষা ও ক্রোধ পুণ্য কর্মাদি বিনষ্ট করে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধীভূত করে ।

माता तु सदा स्नेहार्द्रचित्ता नितरां सन्तान-वत्सला ।
सादरं यथा क्रोडे गृह्णाति रुरुद्यमानं निजपुत्रम् ॥
ईश्वरस्तु सदा भक्तवत्सल: करुणाघनविग्रह: ।
आत्मनि गृह्णाति तथा भक्तस्यश्रद्धया कृतां स्तुतिम् ॥39॥

মাতা তু সদা স্নেহার্দ্রচিত্তা নিতরাং সন্তান-বৎসলা
সাদরং যথা ক্রোড়ে গৃহণাতি রুরুদ্যমানং নিজপুত্রম্
ঈশ্বরস্তু সদা ভক্তবৎসলঃ করুণাঘনবিগ্রহঃ
আত্মানি গৃহণাতি তথা ভক্তস্যশ্রদ্ধয়া কৃতাং স্তুতিম্।

ঈশ্বর ভক্তের সমস্ত সশ্রদ্ধ স্তুতি গ্রহণ করেন, যেমন মাতা তাঁর প্রিয় পুত্রর স্তুতি গ্রহণ করেন স্নেহভরে।

इन्द्रं मित्रं वरुणमगित्माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्ः ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदंत्यगितं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥40॥

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ঃ
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদংত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি এবং দৈবপুরুষ গুরুত্মানের বিষয়ে বর্ণনা করো, তাঁরা সকলেই একই সত্ত্বার প্রতিবিম্ব, মুনিগণ তাঁকে বহু নামে অভিহিত করেন --- অগ্নি, যম, মাতারিশ্ব ইত্যাদি।

उषाकाले अनुदये संध्यायां चास्तमिते रवौ देवं समुपासीत मन्दिरे ।
ध्यायमानश्च तस्य महिमानं देवस्य सायुज्यं प्रार्थय समाजेन सह ॥41॥

উষাকালে অনুদয়ে সন্ধ্যায়াং চাস্তমিতে রবৌ দেবং সমুপাসীত মন্দিরে
ধ্যায়মানশ্চ তস্য মহিমানং দেবস্য সাযুজ্যং প্রার্থয় সমাজেন সহ।

প্রত্যুষ এবং সায়ংকালের অমৃত মুহূর্তে নিজ সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে মন্দিরে পরমাত্মার সহিত সংযোগ স্থাপন করো তাঁর মহিমা কীর্তনের মাধ্যমে।

यस्यापि प्रेमातिशयमस्ति ईश्वर-दर्शनायाचिरात् ।
ईश्वरस्यापि प्रेमातिशयं भवति स्वरूप-प्रदर्शनाय तम् ॥42॥

যস্যাপি প্রেমাতিশয়মস্তি ঈশ্বর-দর্শনাযাচিরাৎ
ঈশ্বরস্যাপি প্রেমাতিশয়ং ভবতি স্বরূপ-প্রদর্শনায় তম্।

যিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করেন, ঈশ্বর তাকে সাক্ষাতের অনুভূতি অবশ্যই প্রদান করেন।

यत्र यत्रापि पृथिव्यां वर्त्तते विद्वान् भगवत्-सेवकोत्तमः ।
ज्ञानान्वेषणाय गन्तव्यं तत्तत् स्थानं तीर्थभूतं पवित्रम् ॥43॥

যত্র যত্রাপি পৃথিব্যাং বর্ত্ততে বিদ্বান্ ভগবৎ-সেবকোত্তমঃ
জ্ঞানান্বেষণায় গন্তব্যং তত্তৎ স্থানং তীর্থভূতং পবিত্রম্।

জ্ঞানের অন্বেষণে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে গমন করবে, কারণ জ্ঞানবান ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবা উত্তমরূপে করতে পারেন। জ্ঞানবান ব্যক্তির সঙ্গলাভও মঙ্গলজনক।

ज्ञानमाहर, ज्ञानवान् वै सदसद् विवेकमेति ।

ऋतं च चरितुं शक्नुयान् मर्त्ये, गतिनिर्देशमाप्नुयात् च स्वर्गलोके ॥44॥

জ্ঞানমাহর, জ্ঞানবান্ বৈ সদসদ্ বিবেকমেতি

ঋতং চ চরিতুং শক্নুয়ান্ মর্ত্ত্যে, গতিনির্দেশমাপ্নুয়াৎ চ স্বর্গলোকে।

জ্ঞান অর্জন করো। জ্ঞান জ্ঞানবানকে সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে এবং পৃথিবীতে ও এমনকি স্বর্গেও তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে ।

तिष्ठास्मिन् जगत्यां नलिनीदलगतजलविन्दुवत्

वित्तं वर्धय, मा भव तदासक्तः

कथं त्वमिह ईश्वरेण प्ररितो यदि न कर्त्तुं जगत् ऋद्धतरम् ! 45॥

তিষ্ঠাস্মিন্ জগত্যাং নলিনীদলগতজলবিন্দুবৎ

বিত্তম্ বর্ধয়, মা ভব তদাসক্তঃ

কথং ত্বমিহ ঈশ্বরেণ প্রেরিতো যদি ন কর্তুং জগৎ ঋদ্ধতরম্।

পদ্মপত্রে নীরবিন্দুর মতো সংসারে অবস্থান করো, ধন সঞ্চয় করো, কিন্তু তাতে আসক্ত হয়ো না, কারণ ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন পৃথিবীকে ধনসমৃদ্ধ করতে।

यदि भवति अन्विष्टं शाश्वतमानन्दम्

भूमानन्दस्वरूपात् प्रार्थय आनन्दमश्नुते ध्रुवम् ॥46॥

যদি ভবতি অন্বিষ্টং শাশ্বতমানন্দম্

ভূমানন্দস্বরূপাত্ প্রার্থয় আনন্দমশ্নুতে ধ্রুবম্।

যিনি অনন্ত আনন্দের অন্বেষণ করেন, তিনি প্রার্থনার দ্বারা সর্বব্যাপী পরমাত্মার নিকট থেকে তার সন্ধান পাবেন।

यस्याचाराः नीतिधर्मनियताश्चिन्तनं च उत्तमं तत्त्वविकाशकरम्

पितरौ तथाचार्याश्च यस्मात् पूजा च सेवा च यथाविधि-प्राप्ताः

यस्तु स्व-दोषाण् विशोधनाय स्वयमेव यतते सर्वदा

स भवति ईश्वरस्य परमप्रेमप्रसादभाजनमिति न संशयम् ॥47॥

যস্যাচারাঃ নীতিধর্মনিয়তাশ্চিন্তনং চ উত্তমং তত্ত্ববিকাশকরম্

পিতরৌ তথাচার্যাশ্চ যস্মাৎ পূজা চ সেবা চ যথাবিধি -প্রাপ্তাঃ

যস্তু স্ব-দোষাণ বিশোধনায় স্বয়মেব যততে সর্বদা

স ভবতি ঈশ্বরস্য পরমপ্রেমপ্রসাদভাজনমিতি ন সংশয়ম্।

নৈতিকতার শিক্ষাসমূহ যিনি পালন করেন, সুচিন্তা নিজের মধ্যে বিকশিত করে তোলেন, পিতামাতাকে ও গুরুকে সম্মান ও সেবা করেন, নিজের দোষসমূহ সংশোধন করেন, তিনি ঈশ্বরের প্রীতি অর্জন করেন।

महत् वै सत्यं मधुमच्च, सत्ये स्थिते पापान्मुच्यते
सत्याद् वलवत्तरो न कश्चिदपि त्राता विद्यते भुतले ॥48॥

মহৎ বৈ সত্যং মধুমচ্চ, সত্যে স্থিতে পাপান্মুচ্যতে
সত্যাদ্ বলবত্তরো ন কশ্চিদপি ত্রাতা বিদ্যতে ভূতলে।

সত্য মহৎ ও মধুর, সত্য পাপ থেকে উদ্ধার করে। পৃথিবীতে সত্য অপেক্ষা শক্তিশালী রক্ষাকর্তা আর কেউ নাই ।

मनो हि सर्वकरणानां ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च ।
मनः-प्रभवा हि प्रवृत्तिराद्या चेष्टितानां कर्मणाम् ॥
सर्वे भावपदार्थाश्चा मनस्येव प्रजायन्ते ॥49॥

মনো হি সর্বকরণানাং জ্যেষ্ঠং চ শ্রেষ্ঠং চ
মনঃ -প্রভবা হি প্রবৃত্তিরাদ্যা চেষ্টিতানাং কর্মণাম্।
সর্বে ভাবপদার্থাশ্চ মনস্যেব প্রজায়ন্তে ।

মনই সর্বকর্মে অগ্রগামী, সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সর্বপ্রকার আপেক্ষিক ধারণার উৎপত্তি মন থেকে হয়।

ईश्वरस्य जीवानां हितार्थं य उत्सृज्यति जीवनं कर्म च
स भवतु प्रेमास्पदं सर्वजनानाम् ।
ईश्वरे तु संशयं यस्य स भवतु घृणाभाजनम् ॥50॥

ঈশ্বরস্য জীবানাং হিতার্থং য উৎসৃজ্যতি জীবনং কর্ম চ
স ভবতু প্রেমাস্পদং সর্বজনানাম্
ঈশ্বরে তু সংশয়ং যস্য স ভবতু ঘৃণাভাজনম্ ।

তাঁরাই বিশ্বাসপরায়ণ যারা ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার এবং উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসীরা মানবতার শত্রু, তাদের ঘৃণা করো।

ईश्वरे परलोके च यस्यास्ति दृढमतिः ।
तेन न कर्त्तव्यं हिंसनं प्रतिवेशिनं कायेन मनसा वापि ॥51॥

ঈশ্বরে পরলোকে চ যস্যাস্তি দৃঢ়মতিঃ
তেন ন কর্ত্তব্যং হিংসনং প্রতিবেশিনং কায়েন মনসা বাপি।

যিনি ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস করেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিবেশীকে শারীরিক অথবা মানসিকভাবে আহত না করেন ।

प्रतिवेशिनां कमपि क्षुधार्त्त पश्यन् तमभुक्तं त्यक्त्वा
धार्मिको जनः स्वयं तु भुरिभोजनं कर्त्तुं न शक्नोति ॥52॥

প্রতিবেশিনাং কমপি ক্ষুধার্ত্তং পশ্যন্ তমভুক্তং ত্যক্ত্বা
ধার্মিকো জনঃ স্বয়ং তু ভুরিভোজনং কর্ত্তুং ন শক্নোতি।

প্রকৃত ধার্মিক প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজের উদর পূর্ণ করবেন না।

जिह्वा यस्य मर्मघातिनी निन्द्यवाक्–भाषणरता ।
यो भवति सदा परपीडन–शोषण–प्रवृत्तिमनस्कः ॥
धर्मानुष्टानादपि न तस्य निष्कृतिः स्यात् कदाचन ।
न कुत्रापि तस्य हिताय प्रायश्चित्तोऽपि विधीयते ॥53॥

জিহ্বা যস্য মর্মঘাতিনী নিন্দ্যবাক্- ভাষণরতা
যো ভবতি সদা পরপীড়ন-শোষণ-প্রবৃত্তিমনস্কঃ
ধর্মানুষ্ঠানাদপি ন তস্য নিষ্কৃতিঃ স্যাৎ কদাচন
ন কুত্রাপি তস্য হিতায় প্রায়শ্চিত্তোঅপি বিধীয়তে।

অপব্যবহার ও পরকে শোষণের প্রবৃত্তির দোষ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের দ্বারা স্খালন হয় না। প্রকৃত অনুশোচনাই একমাত্র পথ।

प्राज्ञश्च विचक्षणश्च स एवास्ते संयता यस्येन्द्रियभोगवासना
यस्यास्ति च पारितोषिके विरक्तिः ॥
स वै मोहान्धकारे निमग्नो अन्धवदज्ञः प्रचरति संसारे
यो भोगलालसापूरणे ताडितोऽपि क्षमां याचते ईश्वरान्मृषा ॥54॥

প্রাজ্ঞশ্চ বিচক্ষণশ্চ স এবাস্তে সংযতা যস্যেন্দ্রিয়ভোগবাসনা
যস্যাস্তি চ পারিতোষিকে বিরক্তিঃ ।
স বৈ মোহান্ধকারে নিমগ্নো অন্ধবদজ্ঞঃ প্রচরতি সংসারে
যো ভোগালালসাপূরণে তাড়িতোঅপি ক্ষমাং যাচতে ঈশ্বরান্মৃষা।

তিনিই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান যিনি ইন্দ্রিয় শক্তি এবং কর্মফলের আকাঙ্খা সংযত করেন; তিনিই অজ্ঞান যিনি ইন্দ্রিয়ের দাস এবং জ্ঞানত কৃত অন্যায় কর্মের পরে ঈশ্বরের ক্ষমাপ্রার্থী হন।

कुतश्चिद् देशादागतं वा काचन जनजातिजातं वा
ईश्वरादभयप्रार्थिनं शरणार्थिनमाश्रयं प्रदेयं मंगलं च विधेयम् ॥55॥

কুতশ্চিদ্ দেশাদাগতং বা কাচন জনজাতিজাতং বা
ঈশ্বরাদ্ভয়প্রার্থিনং শরণার্থিনমাশ্রয়ং প্রদেয়ং মঙ্গলং চ বিধেয়ম্।

পৃথিবীর যে কোনো স্থানের অথবা যে কোনো জাতিভুক্ত মানুষ, যিনি ঈশ্বরের শরণ নেন, তাঁর উপকার করো, যাতে তিনি নিরাপদ ও আশ্বস্ত বোধ করেন।

ईश्वरं केवलं भयं कुर्वाणः सर्वापदि विपदि चैव
न कस्मादपरात् स विभेति निर्भयं जीवतीति ध्रुवम् ॥56॥

ঈশ্বরং কেবলং ভয়ং কুর্বাণঃ সর্বাপদি বিপদি চৈব
ন কস্মাদপরাৎ স বিভেতি নির্ভয়ং জীবতীতি ধ্রুবম্।

তোমার জ্ঞান অনুযায়ী ঈশ্বরকে ভয় করো, তা হলে তুমি নানাবিধ বিঘ্ন ও বিপদে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে, ঈশ্বর তোমাকে জয়ী করবেন।

अतिप्राकृतक्रियासिद्धाश्च ईश्वरस्य मांगल्यवार्त्तावहाश्च केवलम् ।
ते च श्रद्धार्हा स्तथापि उपास्यस्तु एक एवाद्वितीयः परमेश्वरः ॥57॥

অতিপ্রাকৃতক্রিয়াসিদ্ধাশ্চ ঈশ্বরস্য মাঙ্গল্যবার্ত্তাবহাশ্চ কেবলম্
তে চ শ্রদ্ধার্হা স্তথাপি উপাস্যস্তু এক এবাদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ।

যিনি অলৌকিক কর্মে সিদ্ধ তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ, শুভ-বার্তা বহনকারী এবং শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু পূজনীয় একমাত্র পরমপুরুষ, ঈশ্বর ।

विभवे सति तु यो नृशंसो विधिं विहाय चरति जीवनम् ।
अन्यायवृत्तश्च भिक्षामाददाति तं प्रति ईश्वरो भवति पराङ्मुखः ॥58॥

বিভবে সতি তু যো নৃশংসো বিধিং বিহায় চরতি জীবনম্
অন্যায়বৃত্তশ্চ ভিক্ষামাদদাতি তং প্রতি ঈশ্বরো ভবতি পরাঙ্মুখঃ ।

যে ব্যক্তি পাষাণ হৃদয়, ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করেন না। যিনি অনুশাসন লঙ্ঘন করেন, ভিক্ষা করেন, ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখেন।

क्लान्तानां हृदयं य आलादयति आर्त्तानां क्लेशं च ।
यो दूरीकरोति स स्वर्गस्य लभते राजमार्गम् ॥59॥

ক্লান্তানাং হৃদয়ং য আহ্লাদয়তি আর্ত্তানাং ক্লেশং চ
যো দূরীকরোতি স স্বর্গস্য লভতে রাজমার্গম্।

যিনি পীড়িতের হৃদয়কে আনন্দিত করেন, আর্তের দুঃখ দূর করেন, তিনি স্বর্গে দ্রুত গমনের পথ প্রাপ্ত হন।

यः समर्थयते विश्वस्तान् आर्त्तानां च सहायकः ।
स पश्येत् स्वर्गद्वारमपावृतम् ईश्वरमपि सहायकम् ॥60॥

যঃ সমর্থযতে বিশ্বস্তান্ আর্ত্তানাং চ সহায়কঃ
স পশ্যেৎ স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ঈশ্বরমপি সহায়কম্।

প্রয়োজনের সময়ে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের যিনি সাহায্য করেন, যিনি অত্যাচারিতকে সহায়তা প্রদান করেন, স্বর্গের প্রবেশদ্বারে ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করবেন ।

पृष्ठघातो व्यभिचारादपि भयंकरः । ईश्वरः पृष्ठघातिनं
तावन् न क्षमते यावदेवाहतस्य क्षमामसौ न लभेत ॥61॥

পৃষ্ঠঘাতো ব্যভিচারাদপি ভয়ংকরঃ। ঈশ্বরঃ পৃষ্ঠঘাতিনং
তাবন্ ন ক্ষমতে যাবদেবাহতস্য ক্ষমামসৌ ন লভেত।

বিশ্বাসঘাতকতা করা ব্যাভিচার অপেক্ষা দোষণীয়। পৃষ্ঠদেশে যারা ছুরিকাঘাত করে তাদের ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আহত ব্যক্তি নিজে তাদের ক্ষমা করেন।

यस्तु नाचरति भैक्ष्यं परिश्रमेण तु अर्जयति
स्वजीविकां पुरुषस्य तस्य ईश्वरः प्रसीदति ॥62॥

যস্তু নাচরতি ভৈক্ষ্যং পরিশ্রমেণ তু অর্জয়তি
স্বজীবিকাং পুরুশস্য তস্য ঈশ্বরঃ প্রসীদতি।

যিনি নিজের পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ্ করেন, ভিক্ষা করেন না, ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য ও করুণা করেন।

यो ददाति अन्नं स्वजनाय स तवानुगत्यमर्हति
विरोधं तेन सह क्रियते चेत् ईश्वरो भवति विरक्त: ॥63॥

যো দদাতি অন্নং স্বজনায় স তবানুগত্যমর্হতি
বিরোধং তেন সহ ক্রিয়তে চেৎ ঈশ্বরো ভবতি বিরক্তঃ।

তোমার পরিবারের অন্নদাতার প্রতি তোমার অনুগত থাকতে হবে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ঈশ্বরের বিরক্তিকারক।

धनवान् पश्यतु धनवत्तरमुत्तरोत्तरम् ।
दरिद्रोऽपि पश्यतु दरिद्रतरमध: क्रमम् ।
एवमेव विचार्यं तारतम्येन ईश्वर-प्रसादम् ॥64॥

ধনবান্ পশ্যতু ধনবত্তরমুত্তরোত্তরম্
দরিদ্রোঅপি পশ্যতু দরিদ্রতরমধঃ ক্রমম্।
এবমেব বিচার্যং তারতম্যেন ঈশ্বর-প্রসাদম্।

ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁর চেয়ে যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম ধনবান ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করবেন। দরিদ্রেরা দরিদ্রতরদের দেখবেন। তা হলে আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করে ঈশ্বরের করুণা উপলব্ধি করতে পারবেন।

कामी इन्द्रियदासोऽस्ति कामभोगलालसा नीचत्वं नयति ।
निष्ठ जगति पद्मपत्रमिवांभसा। एतद्वै ईश्वरानुशासनम् ॥65॥

কামী ইন্দ্রিয়দাসোঅস্তি কামভোগলালসা নীচত্বং নয়তি
নিষ্ঠ জগতি পদ্মপত্রমিবাংভসা। এতদ্বৈ ঈশ্বরানুশাসনম্।

ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিরা প্রবৃত্তির দাস। ইন্দ্রিয়সুখের সন্ধান মানুষকে হীন করে। ঈশ্বরের বিধানে মানুষকে পদ্মের পাপড়ির মতো হতে হবে। জলের দ্বারা পরিবৃত হয়েও সে যেন সিক্ত না হয়।

विषयसुखत्यागं वा समाजं प्रति यत् कर्त्तव्यम्
तत् त्यागं नैव त्यागमीश्वरप्रीणितम्
कामपाश-विमोचनमिति त्यागमीश्वरसम्मतम् ॥66॥

বিষয়সুখত্যাগং বা সমাজং প্রতি যৎ কর্তব্যম্।
তৎ ত্যাগং নৈব ত্যাগমীশ্বরপ্রোণিতম্
কামপাশ-বিমোচনমিতি ত্যাগমীশ্বরসম্মতম্।

দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করা ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনি চান শুধু বাসনা-কামনার বজ্রমুষ্টিকে পরাভূত করা।

सत्यं यस्य व्रतोपवासं सन्तोषं तीर्थभूतम् ।
दिव्यज्ञानं ध्यानं च यज्ञस्वरूपम् ॥
दया च प्रतिमा यस्य क्षमा वै जपमाला ।
तस्य प्रसीदति ईश्वर: पुरतो नित्यम् ॥67॥

সত্যং যস্য ব্রতোপবাসং সন্তোষং তীর্থভূতম্
দিব্যজ্ঞানং ধ্যানং চ যজ্ঞস্বরূপম্
দয়া চ প্রতিমা যস্য ক্ষমা বৈ জপমালা
তস্য প্রসীদতি ঈশ্বরঃ পুরতো নিত্যম্।

সন্তোষ যাঁদের উপবাস, সত্যপথ যাত্রা যাঁদের তীর্থগমন, তত্ত্বজ্ঞান এবং ধ্যান যাঁদের অবগাহন, করুণা যাঁদের বিগ্রহ এবং ক্ষমা যাঁদের জপমালা, ঈশ্বরের করুণা সর্বাগ্রে তাঁদেরই প্রাপ্য ।

हिंसनात् स्तेयादनृतात् विरतो भव । एष ईश्वरादेश: ॥68॥

হিংসনাৎ স্তেয়াদনৃতাৎ বিরতো ভব। এষ ঈশ্বরাদেশঃ।

ঈশ্বরের বিধান -- হত্যা, চৌর্য্য ও মিথ্যাভাষণ পরিহার করতেই হবে।

ईश्वरं मा दूषय। स्वयं विचारय ।
स्वकृत-पापप्रजातं वै सर्वं तव दु:खभोगम् ॥69॥

ঈশ্বরং মা দূষয়। স্বয়ং বিচারয়
স্বকৃত-পাপপ্রজাতং বৈ সর্বং তব দুঃখভোগম্।

তোমার দুঃখভোগের জন্যে ঈশ্বরকে দায়ী কোরো না, নিজের কৃত পাপের জন্যে নিজের বিচার করো।

ईश्वरं न दूषय यदि तव वारिणा परिपूरितो दीपो अन्धकारं न दूरीकरोति
यदि वा विनष्टेन्धनेनाग्निप्रज्ज्वलनस्य प्रचेष्टा विफला भवति ॥70॥

ঈশ্বরং ন দূষয় যদি তব বারিণা পরিপূরিতো দীপো অন্ধকারং ন দূরীকরোতি
যদি বা বিনষ্টেন্ধনেনাগ্নিপ্রজ্জ্বলনস্য প্রচেষ্টা বিফলা ভবতি।

নিজের প্রদীপ জলে পূর্ণ করে তার দ্বারা আলো জ্বালাবার চেষ্টায় অন্ধকার দূর না হলে, কিংবা ভেজা কাঠে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হলে ঈশ্বরকে দোষারোপ কোরো না।

यावत् तृष्णा स्थिता नृषु संसारसुखभोगस्य
तावद् वृथा तपश्चार्या ईश्वरलाभाय यदि वा कृता ॥71॥

যাবৎ তৃষ্ণা স্থিতা নৃষু সংসারসুখভোগস্য
তাবদ্ বৃথা তপশ্চর্যা ঈশ্বরলাভায় যদি বা কৃতা।

পার্থিব সুখের জন্যে নিজের লালসা যতদিন থাকবে, এমনকি ঈশ্বরের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করা হলেও তা বৃথা হবে।

प्राणरक्षार्थमावश्यकीयद्रव्यजातस्य भोगं न तु पापम् ।
शारीरं स्वास्थ्यरक्षणं सदैव कर्त्तव्यं धर्मसाधनार्थम् ॥
तेन वै वर्त्तते प्रोज्ज्वल: प्रज्ञाप्रदीप: साध्यते चाघकृत्प्रतिरोधम् ॥72॥

প্রাণরক্ষার্থমাবশ্যকীয়দ্রব্যজাতস্য ভোগং ন তু পাপম্ ।
শরীরং স্বাস্থ্যরক্ষণং সদৈব কর্তব্যং ধর্মসাধনার্থম্।
তেন বৈ বর্ততে প্রোজ্জ্বলঃ প্রজ্ঞাপ্রদীপঃ সাধ্যতে চাধকৃৎপ্রতিরোধম্।

জীবনের প্রয়োজনসমূহ সাধন করা পাপ নয়, শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা কর্তব্য, নচেৎ জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা সম্ভব নয়, দুর্বৃত্তকে প্রতিহত করাও সম্ভব হয় না।

बोधे वा चिन्तायां कर्मणि वाचि वा
जीविकार्जने वा चेष्टायां शुद्धिलक्षणा स्यात्
सफला प्रार्थना कृता या ईश्वरसकाशम् ॥73॥

বোধে বা চিন্তায়াং কর্মণি বাচি বা
জীবিকার্জনে বা চেষ্টায়াং শুদ্ধলক্ষণা স্যাৎ।
সফলা প্রার্থনা কৃতা যা ঈশ্বরসকাশম্।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জ্ঞানের, চিন্তার, বাক্যের, কর্মের, জীবিকার ও প্রচেষ্টার শুদ্ধতা-রূপ ফল দান করে ।

मत्स्यमांसवर्जनं दिगम्वरत्वं वा मस्तकमुण्डनम्
कर्दमालिप्ताङ्गं वाग्निहोत्रादिकं चैतानि
कानिचित् कर्माणि मोहग्रस्तं न विशुद्धं कुर्वन्ति ॥74॥

মৎস্যমাংসবর্জনং দিগম্বরত্বং বা মস্তকমুণ্ডনম্
কর্দমালিপ্তাঙ্গম্ বাগ্নিহোত্রাদিকং চৈতানি
কানিচিৎ কর্মাণি মোহগ্রস্তং ন বিশুদ্ধং কুর্বন্তি।

যতদিন না মোহমুক্তি ঘটছে , মৎস্য-মাংস বর্জন, দিগম্বরত্ব, মস্তক মুণ্ডন, কর্দমালিপ্ত দেহ, অগ্নিতে আহুতি দান ইত্যাদি মানুষকে শুদ্ধ করে না।

स एव विश्वासवान् यस्य वाचनं कर्म च
निरापदमिति मन्यन्ते भगवत्-प्रजावर्गाः ॥75॥

স এব বিশ্বাসবান্ যস্য বাচনং কর্ম চ
নিরাপদমিতি মন্যন্তে ভগবৎ-প্রজাবর্গাঃ।

তিনিই বিশ্বস্ত যাঁর হস্ত ও জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টির কোনও বিপদের কারণ না হয়।

ये तु ईश्वर-कर्तृत्वे संशयन्ति कापुरुषाः
ते निकृष्टाः शत्रवश्च ईश्वरस्य, तेषां महती विनष्टिः ॥76॥

যে তু ঈশ্বর-কর্তৃত্বে সংশয়ন্তি কাপুরুষাঃ
তে নিকৃষ্টাঃ শত্রবশ্চ ঈশ্বরস্য, তেষাং মহতী বিনষ্টিঃ।

তারাই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড়ো শত্রু যারা কাপুরুষ এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। এই কাপুরুষেরা মানবজাতির বড় ক্ষতির কারণ।

सत्यमेव वाचं वदेत् प्रतिज्ञातं निर्वाहयेत् ।
न्यस्तदायं सम्पादयेत् मलिनवासनां च परित्यजेत् ॥77॥

সত্যমেব বাচং বদেৎ প্রতিজ্ঞাতং নির্বাহয়েৎ
ন্যস্তদায়ং সম্পাদয়েৎ মলিনবাসনাং চ পরিত্যজেৎ।

সত্য বলো, প্রতিজ্ঞা পালন করো, তোমার প্রতি ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ কোরো না। কোনো অপবিত্র ইচ্ছাকে মনে স্থান দিও না। ঈশ্বর প্রীত হবেন।

यावती स्नेहशीला माता सन्तानं प्रति भवति
तदधिको दयामयो भगवान् स्वयंसृष्टान् प्रजान् प्रति ॥
हिंसनं नार्हति प्रजानां यदि तन्न भवति चानिवार्यम्
खाद्यसंग्रहार्थ वा आत्मसंरक्षणार्थंमपरिहार्यम् ॥78॥

যাবতী স্নেহশীলা মাতা সন্তানং প্রতি ভবতি
তদধিকো দয়াময়ো ভগবান্ স্বয়ংসৃষ্টান্ প্রজান্ প্রতি
হিংসনং নার্হতি প্রজানাং যদি তন্ন ভবতি চানিবার্যম্
খাদ্যসংগ্রহার্থ বা আত্মসংরক্ষণার্থংমপরিহার্যম্।

তাঁর সৃষ্ট সকলের জীবের প্রতি ঈশ্বরের করুণা, সন্তানদের প্রতি মায়ের ভালোবাসার চেয়ে অধিক। খাদ্যের জন্যে অথবা আত্মরক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে, ঈশ্বরের কোনও সৃষ্টিকে বিনাশ কোরো না।

मनो यस्य पवित्रम् वासना च सुसंयता ।
श्लोकोच्चाराश्च मधुस्वनाः स एव भवितुमर्हति
प्रार्थनायां पुरोहितो यजमानेभ्यो वहुदत्तदक्षिणः ॥
कवोष्णमृदुवाक् वै स द्रावणे तु भवति शक्तः ।
यावदेव भ्रान्तिं श्रावकानां वा कुमतिं च तेषाम् ॥79॥

মনো যস্য পবিত্রম্ বাসনা চ সুসংযতা
শ্লোকোচ্চারাশ্চ মধুস্বনাঃ স এব ভবিতুমর্হতি
প্রার্থনায়াং পুরোহিতো যজমানেভ্যো বহুদত্তদক্ষিণঃ
কবোষ্ণমৃদুবাক্ বৈ স দ্রাবণে তু ভবতি শক্তঃ
যাবদেব ভ্রান্তিং শ্রাবকানাং বা কুমতিং চ তেষাম্।

যে কোনো ব্যক্তি, যাঁর মন পবিত্র, যিনি সংযতেন্দ্রিয় এবং যিনি সুমধুর স্বরে শ্লোক আবৃত্তি করতে সক্ষম, তিনিই পুরোহিত (গুরু) হিসাবে পূজায় পৌরোহিত্য করতে পারেন। ভক্তগণ তাঁকে প্রভূত দান করবেন যেন তিনি সচ্ছন্দে দানের অর্থে আনন্দময় সাংসারিক জীবন যাপন করতে পারেন।

विद्वत्वराणां भाषणश्रवणं चान्यान्
विज्ञानतत्त्वप्रवुद्धकरणमुच्यते च
धर्मकर्मानुष्ठानतुल्यं वा तदधिकवरदम् ॥80॥

বিদ্বৎবরাণাং ভাষণশ্রবণং চান্যান্
বিজ্ঞানতত্ত্বপ্রবুদ্ধকরণমুচ্যতে চ
ধর্মকর্মানুষ্ঠানতুল্যং বা তদধিকবরদম্।

বিদ্বানের বচন শ্রবণ করা, অপরের মধ্যে বিজ্ঞানের শিক্ষা সঞ্চারিত করে দেওয়া ধর্মীয় আচারের অপেক্ষা বেশী ফলদায়ী।

मनीषिणां मसिविन्दुश्च वीराणां रक्तविन्दवः
उभयोऽपि पवित्रौ च अमृतोपमावुच्यते ॥81॥

মনীষিণাং মসিবিন্দুশ্চ বীরাণাং রক্তবিন্দবঃ
উভয়োঅপি পবিত্রৌ চ অমৃতোপমাবুচ্যতে।

বিদ্বানের মসি, জাতি রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গকারীর রক্তবিন্দুর সমান পবিত্র।

'सुखी भव ईश्वरप्रसादात्'-एवमुवाच्य मित्रमभिनन्द्येत् ।
स यदि साहाय्यं याचते तत् पार्श्वे स्थितो भव सर्वसम्पत् सह ॥82॥

সুখী ভব ঈশ্বরপ্রসদাৎ-এবমুবাচ্য মিত্রমভিনন্দ্যেৎ
স যদি সাহায্যং যাচতে তৎ পার্শ্বে স্থিতো ভব সর্বসম্পৎ সহ।

বন্ধুকে অভিনন্দন করার সময়ে ঈশ্বরের করুণার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমার সর্বস্ব দিয়ে তোমার বন্ধুর প্রয়োজনের সময় তাঁকে সাহায্য করবে।

ईश्वरः स्वयंशुक्रः स्निह्यति पवित्रजनमसंशयम् ।
दिवा उपोष्य नक्तं पावनं पङ्क्तिभोजनं स्वजनैः सह
एवं यस्तु पौर्णमासमाचरति तस्य वै ईश्वरः प्रसीदति ॥83॥

ঈশ্বরঃ স্বয়ংশুক্রঃ স্নিহ্যতি পবিত্রজনমসংশয়ম্ ।
দিবা উপোষ্য নক্তং পাবনং পঙ্‌ক্তিভোজনং স্বজনৈঃ সহ
এবং যস্তু পৌর্ণমাসমাচরতি তস্য বৈ ঈশ্বরঃ প্রসীদতি।

ঈশ্বর পবিত্র, তিনি পবিত্রজনকে ভালবাসেন। যদি পূর্ণিমার দিন দিবাভাগে উপবাস কর ও স্বজাতিবর্গ ও পরিচিতদের সঙ্গে একত্রে চন্দ্রালোকে ভূরিভোজ কর, তোমার অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের অনেক প্রশমন হবে, তুমি পবিত্র হবে। তোমার পূর্বপুরুষ স্বর্গ থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করবেন এবং তোমাকে বিপদমুক্ত রাখবেন। একে ভোজ উৎসব বলা হয়।

ईश्वरसृष्टेषु जीवेषु यो दयावान् तं प्रति ईश्वरोऽपि दयावान् ।
पशुवधश्चेदनिवार्यं तर्हि तान् स्वल्पतमा पीड़ा भीतिश्च देया ॥
एष ईश्वरादेशः ॥84॥

ঈশ্বরসৃষ্টেষু জীবেষু যো দয়াবান্ তং প্রতি ঈশ্বরোঅপি দয়াবান্
পশুবধশ্চেদনিবার্যং তর্হি তান্ স্বল্পতমা পীড়া ভীতিশ্চ দেয়া।
এষ ঈশ্বরাদেশঃ।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবগণের প্রতি যিনি দয়ালু, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি দয়ালু। একান্তে কোনো প্রাণীকে বধ করা প্রয়োজন হলে, ঈশ্বরের আদেশ, যতদূর সম্ভব কম যন্ত্রণা দান ও সে যাতে ভয় না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

आस्तिको न व्यभिचारी स्यात् परदारं नाभिगच्छेत् ।
न वदेत् प्रतिषिद्धं च सदा सत्ये स्थितो भवेत् ॥85॥

আস্তিকো ন ব্যভিচারী স্যাৎ পরদারং নাভিগচ্ছেৎ
ন বদেৎ প্রতিষিদ্ধং চ সদা সত্যে স্থিতো ভবেৎ।

ঈশ্বরের ভক্তেরা ব্যাভিচারী হবেন না, অপরের স্ত্রীকে কামনা করবেন না, নিষিদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করবেন না। সত্যের প্রতি অবিচল থাকবেন।

पशवश्च भगवत्-सृष्टाः । तान् प्रति सदयो भव ।
यतस्ते च मानुषीवाक्वाचने अशक्ताः ॥
क्षुधार्तेभ्यो तृष्णार्तेभ्यश्च खाद्यं पेयं च दीयताम् ।
ते नैव प्राप्तक्लमाः प्रपीडिताश्च भवन्तु ॥86॥

পশবশ্চ ভগবৎ-সৃষ্টাঃ। তান্ প্রতি সদয়ো ভব।
যতস্তে চ মানুষীবাক্‌বাচনে অশক্তাঃ
ক্ষুধার্তেভ্যো তৃষ্ণার্তেভ্যশ্চ খাদ্যং পেয়ং চ দীয়তাম্
তে নৈব প্রাপ্তক্লমাঃ প্রপীড়িতাশ্চ ভবন্তু।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবজন্তুর প্রতি সদয় হবে, কারণ তারা অবলা। ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খাদ্য ও তৃষ্ণার্তকে পানীয় দান করবে। তাদের ওপর অত্যাচার করা, তাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করানো ঈশ্বরের ক্রোধ উৎপন্ন করে।

श्रावकस्य वोधशक्तिं विभाव्य वक्तुमर्हति वाचम् ।
एषा वै भगवदिच्छा । सर्वविषये युगपदालोच्यमाने
न कश्चिद् विषयो न कस्यापि वोधं गम्यते । भ्रान्तिरेव जायते च ॥87॥

শ্রাবকস্য বোধশক্তিং বিভাব্য বক্তুমর্হতি বাচম্।
এষা বৈ ভগবদিচ্ছা। সর্ববিষয়ে যুগপদালোচ্যমানে
ন কশ্চিদ্ বিষয়ো ন কস্যাপি বোধং গম্যতে। ভ্রান্তিরেব জায়তে চ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানুষ যার সঙ্গে কথা বলছে তার বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষমতা বিবেচনা করে কথা বলবে। সকল বিষয় যদি সব মানুষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়, বোঝায় ভুল হবে, কাজে ভুল হবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

अन्नं देहि क्षुधार्ताय शुक्षुषस्व आतुरं जनम् ।
कश्चिदन्यायेनावद्धश्चेत् कुरु तस्य वन्धनमोचनम् ॥৪৪॥

অন্নং দেহি ক্ষুধার্তায় শুশ্রুষস্ব আতুরং জনম্

কশ্চিদন্যায়েনাবদ্ধশ্চেৎ কুরু তস্য বন্ধনমোচনম্।

ক্ষুধার্তকে অন্নদান করো, অসুস্থ মানুষের সেবা করো। বন্দী যদি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, তাকে মুক্ত করো। ঈশ্বর এতে প্রীত হন।

सह्चराः पापकर्त्तारोऽपि यदि साहाय्यमुपयाचन्ते
पापान्निवार्य तान् कुरुस्व पापविरतान् ॥৪৭॥

সহচরাঃ পাপকর্তারোঅপি যদি সাহায্যমুপযাচন্তে

পাপান্নিবার্য তান্ কুরুস্ব পাপবিরতান্।

মিত্ররা পাপিষ্ঠ হলেও বিপদের মুখে তাদের ছেড়ে যেয়ো না। পাপীকে, পাপ কর্ম করতে নিষেধ করে তাকে সাহায্য করো, পাপ থেকে তাকে নিবৃত্ত করো।

यो योग्यो यः समर्थश्चा करोति कर्म च आत्मनो
परस्य च तत् सहायः प्रसन्नश्चा स्वयं भवति ईश्वरः ॥৭০॥

যো যোগ্যো যঃ সমর্থশ্চ করোতি কর্ম চ আত্মনো

পরস্য চ তৎ সহায়ঃ প্রসন্নশ্চ স্বয়ং ভবতি ঈশ্বরঃ।

যার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা আছে, যাকে নিজের জীবন ধারণের জন্যে এবং অপরের অন্নসংস্থানের জন্যে কাজ করতে হবে, ঈশ্বর তার প্রতি সদয় ।

ईश्वरलाभाय आत्मानं विद्धि
प्रतिजनस्य ज्ञानाहरणमवश्यं करणीयम् ॥৭১॥

ঈশ্বরলাভায় আত্মানং বিদ্ধি

প্রতিজনস্য জ্ঞানাহরণমবশ্যং করণীয়ম্।

ঈশ্বরকে জানতে হলে নিজেকে জানো। জ্ঞান উপার্জন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

नारी तु समादरणीया । एष ईश्वरादेशः
सा वै भवति माता च कन्या च भगिनी वा ।
तां प्रति यत् कर्तव्यं तदकरणं नरकं नयति ॥92॥

নারী তু সমাদরণীয়া। এষ ঈশ্বরাদেশঃ
সা বৈ ভবতি মাতা চ কন্যা চ ভগিনী বা
তাং প্রতি যৎ কর্তব্যং তদকরণং নরকং নয়তি।

ঈশ্বর সমস্ত পুরুষকে আদেশ দিয়েছেন, নারীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, কারণ তাঁরা তোমাদের মাতা ও কন্যা। নারীদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা অথবা দুর্ব্যবহার করলে তোমার সামনে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

प्रतिदानं वा पुनर्लाभमिच्छन् न कुरुस्व किमपि दानम्
एवमनिच्छन्नपि लभेत्तु पुण्यं जगदपिच भवति तव मित्रम् ॥93॥

প্রতিদানং বা পুনর্লাভমিচ্ছন্ ন কুরুস্ব কিমপি দানম্
এবমনিচ্ছন্নপি লভেত্তু পুণ্যং জগদপিচ ভবতি তব মিত্রম্।

কোনও কিছু দান করে তার বদলে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কোরো না। ঈশ্বর তোমাকে পৃথিবীর বান্ধবে পরিণত করবেন এবং সময়ে স্বর্গসুখ দান করবেন।

समुत्पन्ने विवादे तु विचारात् प्रागेव श्रोतव्यम्
उभयपक्षस्य वक्तव्यं यतो विस्पष्टं भवति तथ्यमवितथम् ॥94॥

সমুৎপন্নে বিবাদে তু বিচারাৎ প্রাগেব শ্রোতব্যম্
উভয়পক্ষস্য বক্তব্যং যতো বিস্পষ্টং ভবতি তথ্যমবিতথম্।

বিবাদমান দুই পক্ষ মীমাংসার জন্যে তোমার কাছে এলে উভয় পক্ষেরই বক্তব্য না শুনে কোনও সিদ্ধান্ত করবে না, কারণ প্রকৃত সত্য তোমার গোচরীভূত হলেই ঈশ্বর প্রদত্ত দায়িত্ব সম্যকরূপে সমাধা করতে পারবে।

यो जीवान् द्रुह्यति तेषामनिष्टं करोति च
सर्वजीवेषु यस्य मैत्रीभावना च नास्ति,
पतित: स समाजच्युतिमर्हति ॥95॥

যো জীবান্ দ্রুহ্যতি তেষামনিষ্টং করোতি চ
সর্বজীবেষু যস্য মৈত্রীভাবনা চ নাস্তি
পতিতঃ স সমাজচ্যুতিমর্হতি।

জীবিত প্রাণীকে যে আঘাত করে, তার ক্ষতি করে , জীবিত বস্তুর প্রতি যার সমবেদনা নেই, সে সমাজচ্যুত বলে গণ্য হোক।

शौर्यं तु जगद्-विजयक्षमं जीवने च सुप्रतिष्ठा
कृतिषु च कीर्त्तिमेतत् सर्वमीश्वरानुग्रहे पूर्णतया निर्भरम्
निश्चितं वै निर्णयमेतद् आस्तिक्यवुद्धेर्विशिष्टलक्षणम् ॥96॥

শৌর্যং তু জগদ-বিজয়ক্ষমং জীবনে চ সুপ্রতিষ্ঠা
কৃতিষু চ কীর্তিমেতৎ সর্বমীশ্চরানুগ্রহে পূর্ণতয়া নির্ভরম্ ।
নিশ্চিতং বৈ নির্ণয়মেতদ্ আস্তিক্যবুদ্ধের্বিশিষ্টলক্ষণম্।

তোমার জগৎ জয়ের সাহসই তোমার ঈশ্বর বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং তোমার জীবন ও যাবতীয় কীর্তির জন্যে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা তোমাকে অদম্য সাহস এবং পূর্ণতা দান করবে।

यावदायुस्तावदिह सदा दानशीलो नर: प्रेत्यास्माल्लोकात् ।
पश्यति स्वर्गद्वारं विशालं तस्य कृते उन्मुक्तमनर्गलम् ॥97॥

যাবদায়ুস্তাবদিহ সদা দানশীলো নরঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ ।
পশ্যতি স্বর্গদ্বারং বিশালং তস্য কৃতে উন্মুক্তমনর্গলম্।

এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি দানশীল, স্বর্গের দ্বার তার সামনে উন্মুক্ত থাকে।

हृदयं यत् सदा जीवप्रेमपूरितं तदभीष्टतममिह संसारे ॥98॥

হৃদয়ং যৎ সদা জীবপ্রেমপূরিতং তদ্ভীষ্টতমমিহ সংসারে।

সর্বাপেক্ষা যে বস্তুটির প্রয়োজন অধিক, সেটি হল সর্ব জীবের প্রতি প্রেমপূর্ণ একটি হৃদয়।

आस्ते भग आसीनस्य - चरैवेति चरैवेति ।
चरन् वै मधु विन्दति चरन् स्वादु उदुम्वरम् ॥
पश्य सुर्यस्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन् ।
चरैवेति चरैवेति चरैवेति ॥99॥

আস্তে ভগ আসীনস্য-চরৈবেতি চরৈবেতি
চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু উদুম্বরম্ ।
পশ্য সূর্যস্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্
চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি ।

অকর্মণ্য ব্যক্তির জন্য ঈশ্বর কপালে দুঃখ লিখে দেন। সুতরাং অক্লান্ত কর্মে ব্যাপৃত হও। অরণ্যে রোদন করলে মধু পাওয়া যায় না। মধু আহরণের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। দেখ সূর্য সারাক্ষণ এগিয়ে যাওয়ার ব্রত নিয়েছেন, কখনও আলস্য করেন না, তাই সূর্য চির যৌবনময়। ঈশ্বরে ভরসা রেখে কর্মকাণ্ডে এগিয়ে চল। এগিয়ে চলাই চির যৌবনের ও সৌভাগ্যের দ্বার খুলে দেয়।

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥100॥

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুযাম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ
স্থিরৈরঙ্গ স্তুষ্টুবাংসস্তনুভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হে ঈশ্বর আমাদের জীবন পথে যেন সুন্দর দৃশ্য এবং মনোরম সংবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ হয়। যেন সুস্বাস্থ্য এবং আনন্দময় জীবন আমাদের সঙ্গী হয়। ঈশ্বর প্রদত্ত জীবন যেন ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। সকলের জন্য শান্তি বিরাজ করুক।

मुकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिम् ।
यत् कृपा तमहं वन्दे, परमानन्द माधवम् ॥

মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্
যৎ কৃপা তমহং বন্দে, পরমানন্দ মাধবম্ ।

আমি ভগবান কৃষ্ণকে প্রণাম করি, যাঁর কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করতে পারে। ঈশ্বরের কৃপা বর্ষণ হলে, কৃষ্ণময় জীবন আনন্দভূমিতে পরিণত হয়।

ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরায় 3500 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তার পিতা বসুদেব ও মাতার নাম দেবকী । মথুরার রাজা ছিলেন কংস নামে এক নরপতি। তিনি ছিলেন সম্পর্কে দেবকীর ভাই অর্থাৎ কৃষ্ণের মাতুল। কংস দুর্বৃত্ত, অত্যাচারী ছিলেন, তাঁর অত্যাচার থেকে কেউ নিস্তার পেত না, এমনকি মুনি-ঋষিদেরও তিনি অব্যাহতি দিতেন না। কংস তাঁর পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করে মথুরার রাজমুকুট তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন।

এক দৈবজ্ঞ কংসকে বলেন, "তোমার ভগ্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্রের হাতে তুমি নিহত হবে।" তাই দেবকীর বিবাহের পরেই রাজা কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। প্রত্যেক বার দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই কংস নিজে এসে শিশুটিকে হত্যা করতেন।

দেবকী অষ্টমবার গর্ভবতী হলেন। বিষ্ণুর ভগবৎ সত্তা দেবকীর অষ্টম সন্তানরূপে কারাভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করলেন। সেই সন্তান ভগবান কৃষ্ণ।

কৃষ্ণের জন্মের রাত্রিতে ঝড় উঠল, বজ্রপাত হল, বন্যা দেখা দিল। প্রহরীগণ নিদ্রাভিভূত হলেন এবং অলৌকিকভাবে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হওয়া মাত্র বসুদেব দৈববাণী শুনলেন, "এই শিশুকে যমুনা পার হয়ে গোকুলে নিয়ে যাও। শিশুর জন্মের কথা কেউ জানবার আগেই তুমি কারাগারে ফিরে আসবে।" বসুদেব কালবিলম্ব না করে শিশুকে কোলে তুলে নিলেন, দেখলেন কারাগারের দ্বার আপনি খুলে গেল, যাতে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন।

বসুদেব যমুনার তীরে এসে দেখলেন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে নদী উত্তাল। যাই হোক, বাসুদেব নদীতীরে উপনীত হওয়া মাত্র নদী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বসুদেব, যিনি ভগবৎ-শিশুকে বহন করছেন, তাঁর জন্যে পথ করে দিল। বসুদেব নিরাপদে নদীর অপর তীরে পৌঁছোলেন। দেখলেন গোকুলের অধিবাসীরা নিদ্রামগ্ন।

তিনি গোপালকদের প্রধান নন্দ ও তার মহিষী যশোদার গৃহে প্রবেশ করে শিশু কৃষ্ণকে বন্ধু নন্দের হাতে সর্মপণ করলেন। নন্দ কৃষ্ণকে যশোদার পাশে শুইয়ে দিলেন। যশোদা সেই থেকে হলেন কৃষ্ণের পালিকা মাতা। তিনি শিশু কৃষ্ণকে বড়ো করে তুললেন।

কৃষ্ণের অর্থ কালো। ভগবান কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ ছিলেন। সেই কারণে কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের প্রতি হিন্দুরা বিশেষ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করে।

অত্যাচারী কংস দেবকীর সন্তানের জন্মের কথা শোনামাত্র কারাকক্ষে ছুটে গেলেন নবজাত শিশুকে বধ করবার জন্যে। দেবকীর পুত্রকে বধ করতে না পেরে ক্রোধে অন্ধ হয়ে তিনি বৃন্দাবন এবং তার নিকটবর্তী স্থানের যত শিশু ছিল তাদের সকলকে বধ করার আদেশ দিলেন। কিন্তু সনাতন ধর্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্যে যাঁর জন্ম তিনি অক্ষত থেকে গেলেন এবং তার পরেও তাঁকে বধ করার কংসের সমস্ত চেষ্টা তিনি ব্যর্থ করেছিলেন।

কংস আপসের জন্যে আলোচনা করতে চান, এই ছলনাময় অজুহাতে কৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রূরকে দিয়ে যুবক কৃষ্ণকে মথুরায় ডেকে পাঠালেন। কৃষ্ণের বয়স তখন মাত্র ১৪। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে কংস প্রথমে ভাড়াটে খুনী দিয়ে তারপরে এক মত্ত হস্তীকে দিয়ে তাঁকে বধ করবার চেষ্টা করলেন। শেষপর্যন্ত কৃষ্ণ দৌড়ে কংসের সিংহাসনের কাছে গেলেন এবং এক হাতাহাতি যুদ্ধে বালক কৃষ্ণের দ্বারা কংস নিহত হলেন। কংসের পিতা উগ্রসেনকে কৃষ্ণ আবার সিংহাসনে বসালেন। এক জঘন্য অত্যাচারীর অত্যাচার পর্বের অন্ত হল।

ভগবান কৃষ্ণের বাল্যকালে তাঁকে অনেকবার বধ করার চেষ্টা হয়েছিল। গোয়ালিনী বালিকাদের মধ্যে তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন। বৃন্দাবনে শেষোক্তদের বলত গোপী। বাল্যকালে কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুদের শেখাতেন কীভাবে নৃত্য ও গীতকলার মাধ্যমে জীবনীশক্তির বালকসুলভ প্রাচুর্যের ব্যবহার করতে হয় — একজন গোপী বালিকা রাধা তাঁর সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত বন্ধু ও শিষ্যা ছিলেন।

চতুর্দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নৃত্য, গীত ও বালকসুলভ নানা দুষ্টুমিতে তিনি বাল্যকালের আনন্দ উপভোগ করেন এবং বৃন্দাবনের সকলকে আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে রাখেন। সেই সব আনন্দময় দিনগুলোর ইতিহাস ও স্মৃতি কাহিনী আজও হিন্দুদের মনকে আনন্দময় করে তোলে। সেই সব মধুর সংগীতময় দিনগুলোকে ভিত্তি করে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য তৈরি হয়েছে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে কৃষ্ণ তাঁর বাল্যের বাসভুমি বৃন্দাবন ও বাল্যবন্ধু রাধাকে চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করে মথুরায় চলে যান। সেখানে দুষ্ট রাজা কংসকে তিনি বধ করেন।

বাল্যকালেই কৃষ্ণ ঋষি সন্দীপনীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর আশ্রমে তিনি বেদ, গণিত, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন।

সারাজীবন বঞ্চিত সাধারণ মানুষদেরকে তাদের প্রাপ্য দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণ সংগ্রাম করেছিলেন। সর্বহারাদের জন্যে তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। বঞ্চিতরা যাতে সুবিচার পায় তার জন্যে তিনি লড়াই করেছিলেন এবং তার জন্যে তাঁকে পৃথিবীর সেই সময়কার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনীতিকদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাঁর লক্ষ্য ছিল সনাতন ধর্মকে একই ছাতার নীচে নিয়ে এসে একটি কেন্দ্রীভূত আন্দোলন করে গড়ে তোলা। পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি করেছিলেন, এমন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, যেখানে দরিদ্রতম যে, সেও যেন সসম্মানে জীবনধারণের সুযোগ পায়। কেন্দ্রীভূত সনাতন ধর্মের মাধ্যমে সে সুবিচার সাধারণ জনতাকে দেওয়া সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

নিজ নিজ অস্তিত্বের রক্ষা ও বর্ধনের জন্য তখনকার অনেক হিন্দুরা নেতারা ছোট ছোট গোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে নিজেদের ভগবানের প্রতিভূ বলে প্রচার করতেন এবং নিজেদের ভক্তদের ঠকাতেন। কৃষ্ণকে এর বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এর জন্যে কৃষ্ণকে নিরন্তর কুৎসা এবং বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

তাঁর সময়ে আর এক শক্তিশালী অত্যাচারী রাজা জরাসন্ধ মগধ শাসন করতেন। কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাতা। কংসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে জরাসন্ধ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে বিদেশী এক অশ্বারোহী আক্রমণকারী গোষ্ঠীর নেতা কালযবনকে আমন্ত্রণ জানালেন। নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে কালযবন হিন্দুকুশের এক গিরিবর্ত্ম পার হয়ে এসে কৃষ্ণের মথুরা আক্রমণ করলেন। কৃষ্ণ এক দ্বৈরথ সমরে সহজেই কালযবনকে নিহত করলেন।

জরাসন্ধ কৃষ্ণের অনুগতদের নিপীড়ন, আহত ও হত্যা করে চললেন। সেই দুষ্ট রাজা পুনঃপুনঃ মথুরা অবরোধ করলেন স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে তিনি মথুরায় খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। ভগবান কৃষ্ণ বীরবিক্রমে জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে প্রত্যেক বার পরাস্ত করলেন।

কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন জরাসন্ধের অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও সম্পদের তুলনায় তাঁর আর্থিক সামর্থ্য যৎসামান্য। তিনি দেখলেন, জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস করতে তাঁর ৩০০ বৎসর ধরে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে। জরাসন্ধের সৈন্যবাহিনী ছিল এমনই বিশাল। সেই পরিস্থিতিতে ভগবান কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন মথুরার দরিদ্র প্রজাসাধারণের রক্তক্ষয় বন্ধ করবেন। মথুরায় প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর সব অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে এক দীর্ঘ যাত্রা আরম্ভ করলেন। তাদের নিয়ে প্রায় এক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রতীরে উপনীত হলেন। সেখানে তিনি দ্বারকা নগরী স্থাপন করলেন।

দ্বারকায় শাসনভার তিনি অর্পণ করলেন তাঁর আত্মীয় বৃষ্ণিদের হস্তে। যদিও তিনি স্বয়ং ছিলেন এক বিখ্যাত যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান কূটনীতিক, তিনি কখনও রাজসিংহাসন নিজের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেননি। অনেক অত্যাচারী রাজাকে তিনি দমন করেছিলেন বঞ্চিত প্রজারা যাতে সুবিচার পায়, সেই উদ্দেশ্যে। কিন্তু নিজে কখনও বিজিত রাজ্যের সিংহাসন হস্তগত করেননি। প্রজাদের হাতে তিনি সে বিজিত রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন।

অনেক বৎসর পরে তার বয়স যখন প্রায় ৫৩, পুরানো বন্ধুদের ঐকান্তিক অনুরোধে তিনি আবার বৃন্দাবনে ফিরে এলেন এবং থাকলেন প্রায় এক সপ্তাহকাল। বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করার সময় সাধারণ মানুষেরা প্রবল উৎসাহে তাঁর রথের অশ্বগুলোকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেরাই সে রথ টেনে নিয়ে গেল। আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে হিন্দুরা ভগবান কৃষ্ণের সেই সংক্ষিপ্ত বৃন্দাবনবাসের স্মরণে রথযাত্রা উৎসব পালন করেন।

ভগবান কৃষ্ণকে সমস্ত জীবন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে থাকতে হত, কিন্তু তিনি সর্বদা শান্ত, নিস্পৃহ থাকতেন। সকলের দুঃখযন্ত্রণা তিনি নিজের ওপরে গ্রহণ করতেন। সর্বদা নিজের জীবন বিপন্ন করেও দুর্বল ও বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়াতেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এক দুষ্ট রাজা ছিলেন। নিজের সেবার জন্যে তিনি ১৬০০ যুবতীকে বন্দী করে রেখেছিলেন। নিজের রাজ্যের প্রজাদের তিনি অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিতেন। প্রজারা পরিত্রাণের জন্যে কৃষ্ণের শরণ নিলেন।

ভগবান কৃষ্ণ যুদ্ধ করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজাকে পরাজিত করেন। পরাজিত রাজার পুত্রকে তিনি রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। ১৬০০ নারী মুক্তি পায়, কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাদের আহারের ব্যবস্থা কে করবে, তাদের মানসম্ভ্রম কে রক্ষা করবে, তখন কৃষ্ণ এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠান ঘোষণা করলেন যে, সেদিন থেকে ওই ১৬০০ নারী কৃষ্ণের স্ত্রী হিসাবে যেন গণ্য হবেন এবং রাজ্যের অধিবাসীরা তাঁদের ভরণপোষণ, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং ভগবান কৃষ্ণের স্ত্রী হিসাবে প্রাপ্য সম্মান দেবেন। কেউ তার অন্যথা করলে ভগবান কৃষ্ণ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। এই ১৬০০ রমণীদের কারও সঙ্গে কৃষ্ণের কোনওরকম দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। এই ভাবে এই দুর্ভাগা ১৬০০ রমণীর ভরণপোষণ এবং সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা ভগবান কৃষ্ণ করেছিলেন। আজ পর্যন্ত যে কোনও হিন্দু নারী বিপদে পড়লে কৃষ্ণকে তাঁর স্বামী, রক্ষাকর্তা বলে মনে করে স্বস্তি বোধ করেন।

কৃষ্ণ ছিলেন ধরাধামে শ্রেষ্ঠ মানব। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা দয়ালু, প্রেমময়, অত্যন্ত মেধাবী পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ এবং অপূর্ব বংশীবাদক। তিনি বলবান, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, রাজনীতিক এবং যোদ্ধা হিসাবে অপরাজেয় ছিলেন।

ভগবান কৃষ্ণ সদা সাধারণ মানুষের একজন ছিলেন, অতি সরল জীবনযাপন করতেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন কৃষ্ণ ঈশ্বরের নিজের পুত্র। ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্র ভগবান কৃষ্ণকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সব রকম যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যে, যাতে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার লাঘব হয়।

প্রাসাদে বাস করবার, সুখশয্যায় শয়ন করবার সকল রকম সুযোগ তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় যে কোনও সাধারণ মানুষের মতো অরণ্যের বৃক্ষতলে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। 3430 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর গোলাপের মত বর্ণের পদদ্বয় দূর থেকে দেখে একজন শিকারী তাঁকে একটি লাল পাখী ভ্রম করে একটি বিষাক্ত তীর তাঁর দিকে নিক্ষেপ করে। সেই তীর তাঁর পদদ্বয় বিদ্ধ করে। শিকারী তার ভুল বুঝতে পেরে অতিশয় শোকার্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে স্মিত হাসি হেসে আশীর্বাদ করেন। তার অল্পক্ষণ পরেই তিনি পার্থিব জীবন ত্যাগ করেন।

হাজার হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কৃষ্ণের স্মৃতি তার লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে আজও সজীব। তাঁর মুরলীর মধুর ধ্বনি তাঁর কোটি কোটি ভক্তের কর্ণে কোনওদিন নীরব হয়নি।

নানারূপে কৃষ্ণের পূজা হয়। নারী ও পুরুষের তিনি প্রিয় আদর্শ, শিশুদেরও আদর্শ, বয়স্কদেরও আদর্শ। তিনি একাধারে সর্বাপেক্ষা উদাসীন সন্ন্যাসী ও সর্বাপেক্ষা অপূর্ব গৃহস্থ। রাজার মতো সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও তিনি এক আদর্শ ত্যাগের জীবন যাপন করতেন, তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত পরেই 3430 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমুদ্র গর্ভের ভূকম্পনজাত এক অতি উচ্চ জলোচ্ছ্বাস দ্বারকাকে এবং আরব সাগরের উপকূলের এক বিরাট অংশকে জলপ্লাবিত করে। হিন্দুধর্মের সর্বশেষ স্বর্গীয় দূত অর্থাৎ দেবতা ছিলেন কৃষ্ণ।

ভগবান কৃষ্ণ ঈশ্বরের প্রতিভূ, সকলের ত্রাণকর্তা। যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন তাঁদের সকলকে তিনি সাফল্য, স্বস্তি ও শান্তি দান করেন। তিনি দরিদ্র ও দুর্বলকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। শ্রমজীবী দরিদ্র সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়েছিলেন। রাজমুকুট তিনি কখনও গ্রহণ করেননি। সাধারণ মানুষের পক্ষই তিনি সর্বদা অবলম্বন করেছেন।

ঈশ্বর তাঁর নিজ সন্তান ভগবান কৃষ্ণকে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, সর্ব প্রকার পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে। ভালোমানুষদের যন্ত্রণা যাতে লাঘব নিমিত্ত, তিনি নিজে সে-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তিনি পাপীদের নির্বাসন দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।

যে-কেউ নিজেকে কৃষ্ণের নিকট নিবেদন করবেন, তাঁর সকল দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হবে, তিনি স্বর্গে গিয়ে ঈশ্বরের পাশে থাকবেন, চিরদিন আনন্দে থাকবেন। ভগবান কৃষ্ণ নিজে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি আবার ফিরে আসবেন, ন্যায়পরায়ণ অনুগত জনের দুঃখযন্ত্রণা দূর করবেন।

তিনি স্বয়ং গীতাতে প্রতিজ্ঞা করেছেন :

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्रानाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

ভগবান কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যখনই অত্যাচার হবে লাগাম ছাড়া তিনি আবার জন্মগ্রহণ করবেন অত্যাচারীকে দমন করার জন্য এবং রাজ্যকে অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য এবং এমন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, যেখানে সকলে সসম্মানে ও সুখে জীবনধারণ করতে পারবেন, ন্যায়বিচার পাবেন।

গীতা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানের এক ভাণ্ডার অর্থাৎ গীতা হিন্দুজীবনাদর্শের পথ প্রদর্শক। হিন্দুর কাছে গীতা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান শাস্ত্র। অন্য ধর্মেরও কেউ কেউ গীতা পাঠ করে দৈনন্দিন জীবনে তার অনুসরণ করতে পারেন। গীতা মহাভারতের ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁর শিষ্য অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলির একটি সঙ্কলন।

মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে। যুদ্ধ হয়েছিল ৩৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নয়া দিল্লির উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রে। অর্জুন ছিলেন এক বিরাট যোদ্ধা, একজন পাণ্ডব। এইসব উপদেশ যখন তিনি অর্জুনকে দিচ্ছিলেন, তখন কৃষ্ণ ছিলেন এক ধ্যানে। তিনি সেই বিহ্বল আবিষ্ট ধ্যানযোগেই উপদেশ দিয়েছিলেন, অর্জুনের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে।

গীতার মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণ জীবনযাপনের এবং ঈশ্বর লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ভগবান কৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন, কর্মযোগ (কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা ফললাভ) জ্ঞানযোগ (জ্ঞানের অনুসরণ দ্বারা ফললাভ) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, ঈশ্বর পরম সত্তা, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, ঈশ্বর সকল কারণের কারণ। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, বর্ণভেদ হল প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মবিভাগ

এবং অর্থনৈতিক কারণে মনুষ্য সৃষ্ট ব্যবস্থা, ঈশ্বর কখনোই তার বিধান দেননি। তিনি বলেন, এ বিশ্বের সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর যদি কোনও বস্তুকে অথবা ব্যক্তিকে ঘৃণা করতেন, তিনি নিজে তাকে বিনাশ করতেন। সে কাজের জন্যে তিনি তাঁর ভক্তদের ওপর নির্ভর করে নিজের অক্ষমতা প্রমাণ করতেন না।

গীতা শিক্ষা দেয়, মিথ্যাচারীরা কখনও মোক্ষলাভ করে না। তারা বিপজ্জনক, তাদের সর্বপ্রকারে পরিহার করা উচিত। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয়, আমাদের উচিত আমাদের কাজ উত্তমরূপে সমাধা করা, তৎক্ষণাৎ ফললাভের আকাঙ্ক্ষা না করা, কারণ ফল অবস্থা অনুযায়ী এবং কর্মের অনুপাতে আপনি আসবে।

গীতা বলছেন, সংসার ত্যাগ (অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ) সহজতর, ঈশ্বরের নিকট কম প্রীতিদায়ক, ভগবান কৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সংগ্রাম করতে এবং কর্মযোগের দ্বারা অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম এবং সৎভাবে বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা আনন্দময় জীবনধারণের চেষ্টায় জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং জীবনযুদ্ধে জয়ীরাই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র । গীতা আরও শিক্ষা দেন, প্রকৃত জ্ঞান মিথ্যার ধূম্রজালে আচ্ছাদিত। এই যুগোপযোগী বাস্তব অবস্থার সম্যক ধারণা প্রয়োজনীয় ।

মূল গীতায় শ্লোকের সংখ্যা ৭০০। গীতা ১৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল শ্লোকের কয়েকটি, নিয়মিত যাঁরা পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করেন, তাঁদের জন্যে এখানে প্রদত্ত হল।

গীতার শ্লোক

১

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ।

যে যে-ভাবেই ঈশ্বরকে লাভ করতে চায়, ঈশ্বর সে-ভাবেই তার কাছে যান, কারণ সমস্ত মানুষের সমস্ত ভক্তি একমেবদ্বিতীয়ম ঈশ্বরেরইপন্থা অনুসরণ করে।

২

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु क्दाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঅস্ত্বকর্মণি ।

তোমার অধিকার শুধুমাত্র কর্মে, তার ফলের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হয়ো না। তোমার ফলপ্রাপ্তির পরিমাণ বিচার করো না, কারণ তোমার কর্ম অনুযায়ী ফল স্বতঃই প্রাপ্ত হয়, তার নিবারণ করা যায় না।

৩

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ।

তোমার মন যখন সম্পূর্ণভাবে মোহমুক্ত হয়ে যাবে, তখন তুমি পার্থিব সুখ এবং পরলোকের সুখ সম্পর্কে নিস্পৃহ হবে, তখনই অপার আনন্দ তুমি লাভ করবে।

৪

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তু তে সর্বত এব সর্ব
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বঃ ।

হে অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম ঈশ্বর, আমি সকল দিক থেকে তোমাকে নমস্কার করি। হে সমস্ত বস্তুর অন্তরস্থিত একমাত্র আত্মা, আমি সমস্ত কোণ থেকে তোমায় প্রণাম করি। তুমি অমিত শক্তিশালী, সর্বব্যাপী একমেবদ্বিতীয়ম। অতএব তুমিই সবকিছু।

৫

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।

জ্ঞেয়ং যত্তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ।

তিনিই শ্রেষ্ঠ, যাঁকে জানলে পরমসুখ লাভ হয়। তিনিই এক ব্রহ্ম পরমেশ্বর, তিনি এক অনাদি সত্তা, সমস্ত কারণের কারণ, তিনি সৎ ও অসৎ এর উপর এক অস্তিত্ব।

৬

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ।

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ।

সহস্র সূর্য যদি যুগপৎ আকাশে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে, তাও মহান ঈশ্বরের ঔজ্জ্বল্যের সমকক্ষ হবে না।

৭

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।

সর্বতঃ পাণিপাদং তত্সর্বতোঅক্ষিশিরোমুখম্
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।

যেন সব দিকে তাঁর হস্ত, সমস্ত অভিমুখে তাঁর চক্ষু , মস্তক ও মুখ ও কর্ণ, কারণ সে-সব বিশ্বে সর্বব্যাপ্ত, তাই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের গোচরে।

৮

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ।

নাদত্তে কস্যচিৎপাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।

ঈশ্বর সকলের পাপ পুণ্যের অতীত। জ্ঞান অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন মানুষ মোহের ঘোরে তার সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না।

৯

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেযাম্ নাশিতমাত্মনঃ
তেযামাদিত্যবজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।

সত্যজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হয় এবং অজ্ঞানতা দূর হলে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রজ্ঞা সূর্যের মতো জ্যোতি বিকিরণ করবে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরম জ্ঞান লাভ হবে।

১০

बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেযু কামোঅস্মি ভরতর্যভ ।

ঈশ্বর শক্তিমানের শক্তি, জীবের কামনা-বাসনার উৎস। তাই সামাজিক স্বীকৃত কামপ্রবৃত্তি জীব মাত্রই স্বাভাবিক এবং ধর্মবিরোধী নয়।

১১

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ইনি সকল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত। ঈশ্বর সকল কারণের কারণ, তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি, রক্ষা এবং বিনাশ করেন। ঈশ্বর আদি ও অন্তহীন।

১২

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप: ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ

পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ।

যখন কোনও ব্রত অন্যের ক্ষতির জন্য নেওয়া হয়, তখন ধর্মের নামে কোনও ব্যক্তি যতই শারীরিক বা মানসিক ক্লেশ বরণ করুন না কেন, সেই ব্রত হবে তামসিক এবং ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ।

১৩

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঅনুপকারিণে

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।

কোনও উপকার যখন উপযুক্ত স্থান ও কাল বিবেচনা করে এবং যোগ্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়, সেই উপকার বা দানকে বলা হয় সাত্ত্বিক দান।

১৪

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुन: ।

दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থ ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ।

যখন অনিচ্ছা সহকারে অথবা প্রতিদান লাভের আশায় দান করা হয়, তাকে বলা হয় রাজসিক এবং ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

১৫

ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশোঅর্জুন তিষ্ঠতি

ভ্রাময়ন্সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ।

ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। সমস্ত প্রাণী নিজ কর্ম ফল অনুযায়ী এই সংসারে আবর্তিত হন।

১৬

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঅন্যোঅব্যক্তোঅব্যক্তাৎসনাতনঃ
যঃ স সর্বেষু ভূতেযু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ।

এই বিশ্বে এবং এর বাইরে আরো বহু বিশ্ব জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনে আবর্তন করে। কিন্তু ঈশ্বর জন্ম মৃত্যু হীন।

১৭

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তত্প্রেত্য নো ইহ ।

ঈশ্বর বিশ্বাস ব্যতিরেকে কৃত কর্ম, উৎসর্গ, কৃচ্ছ্রসাধন ইত্যাদি সকল সৎ কর্মই নিষ্ফল।

১৮

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ।

একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ যা কিছু করেন, অন্যরাও তাই করে। তিনি যে মান নির্দিষ্ট করে দেন, অন্যরা তাই অনুসরণ করে।

১৯

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্
সংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ।

ঈশ্বর তাঁর কর্ম থেকে বিরত হলে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস হবে। তেমনি কর্মে বিরত হয়ে কোনও কোনও মানুষ গোলযোগের সৃষ্টি করলে, সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

२०

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मन: ।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे: परतस्तु स: ।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ।

ইন্দ্রিয়সকল দেহ অপেক্ষা মহত্তর, কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল অপেক্ষা মন মহত্তর। মন অপেক্ষা বুদ্ধি মহত্তর, বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি মহত্তর তিনি ঈশ্বর (বিবেক)।

২১

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরংতপ
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এইসব উপাধি মানুষের নিজ নিজ কর্মের গুণ অনুযায়ী প্রদত্ত হবে।

২২

संन्यासस्तु महाबाहो दु:खमाप्तुमयोगत: ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ।

কর্মযোগ ব্যতীত সাংখ্যযোগ (অর্থাৎ দেহ , ইন্দ্রিয়াদি ও মন) সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কর্মের কারকত্ব পরিহার সাধন দুরূহ; পক্ষান্তরে কর্মযোগী, যিনি ঈশ্বরে তাঁর মন স্থিত রাখেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।

২৩

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु: ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ।

ঈশ্বর মানুষের কর্মকারকত্ব, কিংবা কর্ম নির্দিষ্ট করে দেন না, তার কর্মফলও নির্দিষ্ট করেন না। মানুষের নিজের স্বভাবেই সব কিছু করে।

২৪

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय: ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ।

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ।

কর্মযোগী যিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, তাঁর করুণা প্রাপ্ত হন, অমরত্ব লাভ করেন কর্ম সাধনের মধ্যেই।

২৫

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण: ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मण: ।

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ ।

তোমার নির্দিষ্ট কর্ম সাধন করো, কারণ নিষ্কর্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেয়। সর্ব কর্ম পরিহার করলে শরীরও রক্ষা করা যায় না।

২৬

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस: ।
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता: ।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাং ।

ভ্রান্ত ব্যক্তি যারা ধংসাত্মক কার্য ও নিস্ফল আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গ লাভের মিথ্যা আশা পোষণ করে, তারা ছলনাময় রাক্ষস। ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেন।

২৭

यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रता: ।
भुतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্নি তৃন্যান্তি পিতৃব্রতাঃ
ভুতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঅপি মাম্ ।

যাঁরা দেবতাদের কাছে ব্রত করেন , তারা দেবতাদের কাছে গমন করেন, যারা প্রেতদিগের উপাসনা করে তারা প্রেতদের কাছে যায়, যাঁরা ঈশ্বরের উপাসনা করে তাঁরা একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই গমন করেন।

২৮

य: सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।

যিনি কোনো কিছুতেই আসক্ত নন, যিনি ভালো ও মন্দে উল্লসিত ও ভীত হন না, তিনিই স্থিতপ্রাজ্ঞ।

২৯

क्रोधाद्भवति सम्मोह: सम्मोहात्स्मृतिविभ्रम: ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রনশ্যতি ।

ক্রোধ থেকে মোহের জন্ম হয়, মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ জন্মায়, স্মৃতিভ্রংশ জন্ম দেয় বুদ্ধিভ্রংশের, বুদ্ধিভ্রংশ আনে সমূলে বিনষ্টি।

৩০

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঅশ্নুতে
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ।

কর্ম না করে কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কর্মে বিরত হলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

৩১

न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवश: कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणै: ।

ন হি কশ্চিতক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কেউ কখনও এক মুহূর্তও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না, কারণ প্রত্যেকেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে অসহায়ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

৩২

तस्मादसक्त: सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्त्ये ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पुरुष: ।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর
অসক্ত্যে হ্যাচরন্কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ।

অনাসক্ত হয়ে উত্তমরূপে নিজের কর্ম করে যাও। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।

৩৩

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्टभिधास्यति ।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशय: ।

য ইমম্ পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্টভিধ্যাস্যতি
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ।

যিনি সর্বোচ্চ প্রেম ঈশ্বরকে নিবেদন করেন, জনসাধারণের মধ্যে এই শাস্ত্রের গভীরতম বার্তা প্রচার করেন, তিনি স্বর্গলাভ করবেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

৩৪

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश: ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ।

চাতুবর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ।

সমাজের চারটি শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে তাদের প্রধান প্রধান গুণ এবং সেই অনুযায়ী কর্তব্যের ওপর; এবং এই শ্রেণী বিভাগ আমাদের মতো নশ্বর মানুষেরাই করেছে। অমর ঈশ্বরের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

৩৫

श्रेयान्स्वधर्मो विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह: ।

শ্রেয়ান্স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।

নিজের ধর্ম (তার যদি কোনও গুণও না থাকে) সুচারু রূপে সম্পাদিত করা অন্যের কতর্ব্যের চেয়ে শ্রেয়। নিজের ধর্ম সম্পাদনে মৃত্যুও শুভ ফল দায়ী, অন্যের ধর্মে ভয়ের সুপ্ত কারণ থাকে।

৩৬

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।

সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ
তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎকর্মযোগো বিশিষ্যতে ।

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই পরম কল্যাণকর, তবে কর্মযোগ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে জ্ঞানযোগ অপেক্ষা শ্রেয়।

৩৭

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ।

যাঁরা জ্ঞানী নন, অজ্ঞান, তাঁরাই বলেন, সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ পৃথক পৃথক ফল দান করে, যিনি ওই দুটির যে কোনোও একটিতে দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠাবান তিনি দুটিরই শুভ ফল লাভ করে থাকেন। (দুটিই অভিন্ন, ঈশ্বর প্রাপ্তি)।

৩৮

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে ।

যে কর্ম শাস্ত্র-নির্দিষ্ট, কারকত্ববোধ বিরহিত, ফললাভাকাঙ্ক্ষামুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পক্ষপাত ও দ্বেষদুষ্ট নয়, তাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

৩৯

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঅশুচিঃ
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ।

যে কর্মকারক আসক্তিযুক্ত কর্মফল আকাঙ্ক্ষী, লোভী, স্বভাবে অত্যাচারী, যার আচরণ অপবিত্র, যিনি সুখ দুঃখ দ্বারা প্রভাবিত, তাকে পরিহার করা কর্তব্য, কারণ তিনি স্বার্থপর রাজসিক।

৪০

यत: प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव: ।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।

মানুষের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর উপাসনা তার নিজের কর্তব্য পালনে। ঈশ্বর থেকেই সৃষ্টির স্রোত উৎসারিত, তিনিই বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত।

৪১

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ।

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্
ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ।

যে বাহ্যত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সংযত করে অন্তরে ইন্দ্রিয় সুখের বস্তু সকলের চিন্তা করে, সে ভ্রান্তবুদ্ধি ভণ্ড।

৪২

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ।

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ।

কর্ম বিমুখ ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব নয়। কর্মে নিজেকে ব্যাপৃত না করে কোনটা সৎকর্ম এবং কোনটা অসৎ কর্ম তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

৪৩

यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ।

জনসেবা, দান, জ্ঞান অন্বেষণ অবশ্যকরণীয় কারণ জনসেবা দান ও জ্ঞান অন্বেষণই প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম।

৪৪

दु:खमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ।

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ।

দৈহিক ক্লেশ পরিহারের উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ তা রাজসিক, তার দ্বারা ত্যাগের ফল লাভ হয় না।

৪৫

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ।

দেহধারীর পক্ষে সকল কর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কর্মের ফল যিনি ত্যাগ করেন একমাত্র তাঁকেই ত্যাগী বলা হয়।

৪৬

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ।

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ।

গীতার এই গুহ্যতত্ত্ব তার কাছে কখনোই প্রকাশ করবে না যে জ্ঞান অন্বেষণ করে না, যে ভক্তিশূন্য, যে শ্রবণ করতে আগ্রহী নয়; এবং তার কাছে কখনোই নয় যে ঈশ্বরের দোষ অনুসন্ধান করে।

৪৭

अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ।

যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা ঈশ্বরকে কখনোই উপলব্ধি করতে পারবে না। তাদের উচ্চাশা যাই হোক, তারা হতাশা ও মৃত্যুর চক্রপথে আবর্তিত হবে।

৪৮

क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ।

কাপুরুষতার কাছে আত্মসমর্পণ কোরো না। ভীরুতা ও হৃদয়দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে দাও। তুমি শত্রুদগ্ধকারী, তুমি উঠে দাঁড়াও।

দৈনিক প্রার্থনা

হিন্দুদের অবশ্য কর্তব্য

মন্ত্র

সব হিন্দুর কর্তব্য দিনে অন্তত দুবার নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা। দশ বছরের বেশি বয়সের সব পুরুষ, নারীকে এই মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করতে হবে। বৈদিক সুরে ও ছন্দে উচ্চারিত হলে মন্ত্রগুলি আবৃত্তিকারকে এক অভূতপূর্ব স্বাস্থ্য, অর্থ, বিষয়সম্পত্তি, শক্তি ও শান্তি দান করে। সর্ব প্রচেষ্টায় আবৃত্তিকার সাফল্য ও সুস্থ জীবন লাভ করেন। যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময় আবৃত্তি করা যায়, তবে শ্রেষ্ঠ ফলের জন্য প্রত্যুষে এবং সায়ংকালে মন্দিরে অথবা উদ্যানে অন্যদের সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে আবৃত্তি করা উচিত। অনেক হাজার বছর ধরে এই সব মন্ত্র শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুর সংযোগে আবৃত্তি অলৌকিক কম্পনের সৃষ্টি করে, তার ফলে আবৃত্তিকারের চতুর্দিকে এক অদৃশ্য সুরক্ষা আবরণের সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও এই সব মন্ত্রশক্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি কিন্তু শক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে। যে কোনো ব্যক্তি এই সব মন্ত্র আবৃত্তি করতে পারেন ও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন :

ॐ श्री विष्णु: ॐ श्री विष्णु: ॐ श्री विष्णु:

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।
धियो यो न: प्रचोदयात् ॥

ওঁ শ্রী বিষ্ণুঃ ওঁ শ্রী বিষ্ণুঃ ওঁ শ্রী বিষ্ণুঃ
ওঁ ভূভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।

ॐ जवाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ।
घ्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥
ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ম্ মহাদ্যুতিম্ ।
ধ্যান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঅস্মি দিবাকরম্ ।

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ
निर्विघ्नं कुरू मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥
ॐ नमो गणपतये । ॐ नमो गणपतये ॥
ওঁ বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটিসমপ্রভ
নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা
ওঁ নমো গণপতয়ে । ওঁ নমো গণপতয়ে ।

ॐ बन्दे सर्वभूते विराजमानम् ईश्वरम् एकमेवाद्वितीयम् ।
प्रणमामि देवरूपेण तान् सर्वान् ईश्वरप्रेरितदूतान् ॥
ईश्वर-प्रेरिता दूता आगच्छन्ति देवरूपेण पुनः पुनः ।
तन्मध्ये श्रेष्ठत्रयं ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः ॥
ওঁ বন্দে সর্বভূতে বিরাজমানম্ ঈশ্বরম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্
প্রণমামি দেবরূপেণ তান্ সর্বান্ ঈশ্বরপ্রেরিতদূতান্
ঈশ্বর-প্রেরিতা দূতা আগচ্ছন্তি দেবরূপেণ পুনঃ পুনঃ
তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠত্রয়ং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।

ॐ नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।

ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।

ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय ।
नित्याय शुद्धाय दिगम्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥

ওঁ নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায় তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায় ।

ॐ मन्दाकिनी सलिल-चन्दनचर्चिताय
नन्दीश्वर-प्रमथनाथ-महेश्वराय ।
मन्दारपुष्प-बहुपुष्प सुपुजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥

ওঁ মন্দাকিনী সলিল-চন্দনচর্চিতায়
নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায়।
মন্দারপুষ্প-বহুপুষ্প সুপুজিতায় তস্মৈ মকারায় নমঃ শিবায় ।

ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे ।
निवेदयामि चात्मानं त्वं गतिः परमेश्वरः ॥

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ।

ॐ त्र्यंम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ ।

ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये, शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते!

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ।

ॐ त्रिमस्तकानां ज्ञानम् एकशिरे अवस्थितं ।
चतुर्बाहुतुल्यबलं द्विहस्ते रोपितम् ॥
भक्तेच्छापूरणार्थं पुनः पुनः आविर्भूतम् ।
प्रणमामि तं हि ईश्वरप्रेरितदूतम् ॥

ওঁ ত্রিমস্তকানাং জ্ঞানম্ একশিরে অবস্থিতং
চতুর্বাহুতুল্যবলং দ্বিহস্তে রোপিতম্ ।
ভক্তেচ্ছাপূরণার্থং পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতম্
প্রণমামি তং হি ঈশ্বরপ্রেরিতদূতম্ ।

ॐ य आस्तिको धर्मनिष्ठः स वै शूरो न नास्तिकः ।
नास्तिकः कापुरुषोऽभुत् पृथिव्यां परिधावति ॥
एकाशं स्वोपार्जनेस्य देयम् दीनजनाय ।
यो भुंजीत-स्वयमेव, स मोघं केवलादी च ॥

ওঁ য আস্তিকো ধর্মনিষ্ঠঃ স বৈ শূরো ন নাস্তিকঃ
নাস্তিকঃ কাপুরুষোঽভূৎ পৃথিব্যাং পরিধাবতি ।
একাংশং স্বোপার্জনেস্য দেয়ম্ দীনজনায় ।
যো ভুঞ্জীত-স্বয়মেব, স মোঘং কেবলাদী চ ।

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

ওঁ ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ।

ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

ওঁ ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব মম দেবদেব ।

দশ বছরের অধিক বয়স্ক প্রত্যেক হিন্দুর ধর্ম রক্ষার্থে কিছু কর্তব্য রয়েছে। ১) সকালে একবার এবং রাত্রে একবার অন্তত পাঁচ মিনিট করে সময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পনেরোটি মন্ত্র এক এক করে পাঠ করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে মন্ত্রের অর্থ উপলব্ধি করতে। ২) দিনে অন্তত একবার দশ মিনিট প্রাণায়াম করতে হবে। ৩) মাসে একবার আত্মীয়, বন্ধু, পাড়া-পড়শীদের নিয়ে নিজের সাধ্যমত 'ভোজ উৎসব' আয়োজন করতে হবে অথবা অন্যের আয়োজিত 'ভোজ উৎসবে' যোগদান করতে হবে।

প্রাণায়াম অত্যন্ত সহজ। শিরদাঁড়া সোজা রেখে মাটিতে পদ্মাসন ভঙ্গিতে বসে বা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাসারন্ধ্র বন্ধ করে বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস টানতে হবে, এবার তর্জনী দিয়ে বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করে ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে পুরোপুরি শ্বাস ছাড়তে হবে। আবার ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে পুরো শ্বাস টানতে হবে এবং এবার বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ডান নাসারন্ধ্র বন্ধ করে বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে পুরো শ্বাস ছাড়তে হবে এবং বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে আবার পুরো শ্বাস টেনে, তর্জনী দিয়ে বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করে, ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে শ্বাস পুরো ছাড়তে হবে এবং তারপর ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে আবার পুরো শ্বাস টানতে হবে। শ্বাস টেনে বুড়ো

আঙ্গুল দিয়ে ডান নাসারন্ধ্র বন্ধ করে, বাম নাসারন্ধ্র দিয়ে পুরো শ্বাস ছেড়ে আবার সেই নাসারন্ধ্র দিয়ে পুরো শ্বাস টানতে হবে এবং বাম নাসারন্ধ্র বন্ধ করে ডান নাসারন্ধ্র দিয়ে ছাড়তে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ভাবে দিনের যে কোনও সময়ে প্রাণায়াম করতে হবে। ভরা পেটে প্রাণায়াম করা উচিৎ নয়। দরকারে যোগ্য ব্যক্তির থেকে শিখে নেওয়া যেতে পারে।

যারা হিন্দু ধর্ম পালন করবেন তারা এবং তাদের নিকট আত্মীয়রা সুস্থ, সুখী, সমৃদ্ধ এবং আনন্দময় জীবন কাটাবেন।

মনে রাখতে হবে সামান্য বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিচার করার চেষ্টা বড় নির্বুদ্ধিতা।

কোনও মানুষকে উচ্চ, নীচ ভেদাভেদ করা, অন্যের ক্ষতি করে স্বীয় স্বার্থসাধন করা, জীবনে অলসতা এবং ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হিন্দুর পক্ষে পাপ।

এখানে যে পনেরোটি মন্ত্র দেওয়া হয়েছে তা বীজ মন্ত্র এবং সংসারে সুখ এবং জীবনান্তে স্বর্গ প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু নানা উৎসবে যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন, কোনও দেবদেবতার পূজা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মন্ত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রাসঙ্গিক মন্ত্রসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

কোনও পূজায় অথবা উৎসবে এই পনেরোটি মন্ত্রই ভক্তিভরে সকলে মিলে পাঠ করা প্রয়োজন। আমাদের লোকাচারে উপকরণের ব্যবহার কখনও নিজ ঐশ্বর্য প্রদর্শনের জন্য করা হয়, কখনও বা ভক্তের উপর নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পুরোহিতরা আর্থিক বোঝা চাপান। এটা প্রয়োজন অতিরিক্ত। উপাচার ঈশ্বর গ্রহণ করেন না।

ভজন

ভজন ঈশ্বরের গুণপনার অভিব্যক্তি। মহান ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের ভজন সমবেত স্বরে গাওয়া কর্তব্য।

भजतामीशं जपतामीशं समवेतं सर्व जनेषु रे
नाशित सर्व प्रभेदजनो ईशमनसि खलु स वसति रे ॥
भजतामीशं जपतामीशं समवेतं सर्व जनेषु रे
य विश्वसिति परमेश्वरं भयहीन: खलु स भवति रे ॥
भजतामीशं जपतामीशं समवेतं सर्व जनेषु रे
य: करोति स्वधर्म रक्षामीश मनसि खलु स वसति रे ॥
भजतामीशं जपतामीशं समवेतं सर्व जनेषु रे
य: पूजयति परमेश्वरं-अमर लोकं खलु स गच्छति रे ॥

ভজতামীশং জপতামীশং সমবেতং সর্ব জনেষু রে
নাশিত সর্ব প্রভেদজনো ঈশমনসি খলু স বসতি রে ।
ভজতামীশং জপতামীশং সমবেতং সর্ব জনেষু রে
য বিশ্বসিতি পরমেশ্বরং ভয়হীনঃ খলু স ভবতি রে ।
ভজতামীশং জপতামীশং সমবেতং সর্ব জনেষু রে
যঃ করোতি স্বধর্ম রক্ষামীশ মনসি খলু স বসতি রে ।
ভজতামীশং জপতামীশং সমবেতং সর্ব জনেষু রে
যঃ পূজয়তি পরমেশ্বর-অমর লোকং খলু স গচ্ছতি রে ।

স্বর্গ ও নরক

যাঁরা ঈশ্বরের সাধনা করেন না তারা নরকে যান। যাঁরা ঈশ্বরের নিয়ম ও মনুষ্যত্ব বিরোধী কাজ করেন, তাঁরা মানুষের দুঃখের কারণ হবেন। নরকে তাদের ফুটন্ত জলের মধ্যে দেওয়া হয় — কুষ্ঠ রোগী তাদের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী হয় — নিয়মিত খাবার হিসাবে তাদের কাঁটাযুক্ত (ক্যাকটাস) খাবার খেতে দেওয়া হয়। সবসময় তাঁরা তৃষ্ণার্ত থাকেন এবং সর্বদা নানা রকম ব্যাধির প্রকোপে পড়েন, সাথী হয় দুষ্ট পাপীরা। পচা দুর্গন্ধময় মৃত দেহের মধ্যে সবসময় থাকতে হয়।

যাঁরা মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য কাজ করেন এবং জীবজগতে সকলের শুভ চান এবং সেইমত কাজ করেন, যাঁরা মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার বন্ধু, যাঁরা গীতা এবং বেদ প্রদত্ত নিয়মমত জীবন ধারণ করেন, যাঁরা নিয়মিত যোগ অভ্যাস এবং ঈশ্বরের সাধনা করেন তাঁরা স্বর্গে যান। স্বর্গে তাঁদের জন্য সুরক্ষিত থাকে সুন্দর আরামপ্রদ বাসস্থান। এই বাসস্থানের সামনে সমুদ্র এবং পশ্চাতে থাকে তুষারে আবৃত শৈলশ্রেণী। স্বর্গে তাঁরা সদা হাস্যময় বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত থাকেন। সর্বদা তাঁরা উপভোগ করেন সম্মান, মর্যাদা এবং আনন্দ। তাঁরা সত্যিকার জ্ঞানের অধিকারী হন।

তাঁরা স্বর্গে সুস্বাদু খাবার খাবেন — সুস্বাস্থ্য এবং মনোরম জীবনসঙ্গী পাবেন সুখী দাম্পত্যজীবন যাপনের জন্য। প্রতিদিন নারী পুরুষের মিলনের চরম আনন্দের অধিকারী হবেন স্বর্গবাসীরা। দাম্পত্যজীবন সঙ্গীরা প্রতিদিন ঈশ্বরের কৃপায় বিভিন্ন ধরনের আকর্ষক মানুষের নূতন রূপ নেবেন।

যা কিছু ভালো এবং ঈপ্সিত তা ইচ্ছেমতো স্বর্গে ভোগ করা যায়। স্বর্গবাসীরা পরমানন্দে প্রতিদিন ঈশ্বরের সান্নিধ্যসুখ উপভোগ করেন এবং ঈশ্বরের কৃপা সর্বদা বর্ষিত হয় তাঁদের এবং তাঁদের সন্তান সন্ততির ওপর।

মূর্তিপূজা

''আমরা প্রত্যেকে রাজাধিরাজ ঈশ্বরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।''

হিন্দুর দৃষ্টিতে ঈশ্বর একমাত্র পরম আরাধ্য দেবতা। অন্য কোনও দেবতাকে ঈশ্বর জ্ঞান করার কোনও প্রশ্ন নাই। ঈশ্বর (দেবতে/ দেবাড়ু / ঈশ্বরণ/ কাডাভু/ ইরাইবন, এই সব নামেও দক্ষিণ ভারতে অভিহিত হয়ে থাকেন) সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান, কোন কার্য সমাধা করবার জন্যে তাঁর কোনোরকম সহযোগীর প্রয়োজন হয় না। পরমেশ্বর তাঁকেই বলা হয় যাঁর নাম ও রূপ থেকে এই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি। তাঁরই করুণায় পৃথিবীর অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাঁরই ইচ্ছায় এর বিলয়।

ईश्वर: परमैकस्वरूप: ॥
स नित्य:सर्वव्यापी विभुरनादिरनन्तश्च स निराकारो निरूपो वर्णनातीतो निष्कम्पश्च ।
क्वचित् शब्दरूपेण स आत्मानं प्रकाशयति स विधाता
कारणानां कारणं तथा सर्वशक्तिमान् तदिच्छापुरणाय कस्यापि सहायस्य प्रयोजनं न वर्तते
यतो द्वितीय: कोऽपि नास्ति ॥

ঈশ্বরঃ পরমৈকস্বরূপঃ
স নিত্যঃ সর্বব্যাপী বিভুরনাদিরনন্তশ্চ স নিরাকারো নিরূপো বর্ণনাতীতো নিষ্কম্পশ্চ ।
ক্বচিৎ শব্দরূপেণ স আত্মানং প্রকাশয়তি স বিধাতা
কারণানাং কারণং তথা সর্বশক্তিমান্ তদিচ্ছাপুরণায় কস্যাপি সহায়স্য প্রয়োজনং ন বর্ততে ।
যতো দ্বিতীয়ঃ কোঅপি নাস্তি ।

ঈশ্বর পরমৈশ্বর্যস্বরূপ, নিত্য, সর্বব্যাপী, অনাদি-অনন্ত, নিরূপ, বর্ণনাতীত, নিষ্কম্প। কখনও কখনও শব্দরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত কারণের কারণ, তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁর কোনও সহায়কের প্রয়োজন হয় না।

ঈশ্বর পরম সত্য। তাঁর আরেক নাম বিষ্ণুঁ। বিষ্ণুঁ এবং ব্রহ্মাকে সনাতন ধর্মের দুই আদি দেবতা বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। বানানের সাদৃশ্যের জন্যে ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। সে-বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বিষ্ণুঁ শব্দটির উৎপত্তি 'বিস' থেকে, যার অর্থ ব্যাপ্তি। বিষ্ণুঁ সর্বব্যাপী ঈশ্বর যার আদিও নেই, অন্তও নেই। তাঁর জন্মদাতার প্রয়োজন হয়নি। মানুষই এই পরমপুরুষকে নাম দিয়েছে 'ঈশ্বর', বিভিন্ন ধর্মের লোক তাঁর বিভিন্ন নাম দিয়েছে। হিন্দুরা তাঁকে বলে ঈশ্বর/ব্রহ্ম প্রভৃতি। ঈশ্বরের প্রতীক '**ওঁ**'।

বেদ বলেছেন :

ईश्वर: तस्य दूतरूपेण पृथिव्यां प्रेरयति देवान्
तस्माच्च मङ्गलं मनुष्यत्वं प्रापतेति ॥

ঈশ্বরঃ তস্য দূতরূপেণ পৃথিব্যাং প্রেরয়তি দেবান্
তস্মাচ্চ মঙ্গলং মনুষ্যত্বং প্রাপ্নোতি ।

ঈশ্বর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দেবতাদের তাঁর দূতরূপে প্রেরণ করেন, যার ফলে মানবজাতির মঙ্গল হয়।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের এক অংশ দেবতারূপে বিশ্ববাসীর কাছে প্রেরণ করেন মানুষকে অধিকতর ফলদায়ী সুসমঞ্জস জীবন যাপনের পথ প্রদর্শনের জন্য।

এই দূতগণকে হিন্দুরা ঈশ্বরের প্রতিরূপ হিসাবে গণ্য করেন এবং তাঁরা দেবতা নামে অভিহিত হন। এঁরা অতিশয় আদৃত ও শ্রদ্ধাস্পদ হিন্দুবীর। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এই পৃথিবীতে লীলার অন্তে (অর্থাৎ মর্ত্যজীবের ন্যায় পার্থিব জীবনের অবসানে) তাঁরা স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করে ঈশ্বরের মধ্যে লীন হয়ে যান।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, দেবতাগণ এই পৃথিবীতে বর্তমান না থেকেও পথপ্রদর্শন ও সাহায্য করতে পারেন। হিন্দুরা এই দেবদূতদের মূর্তি নির্মাণ করে উৎসব করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ঈশ্বরের পূজা করেন। এই দূতদের বলা হয় প্রতিমা অথবা দেবতা। হিন্দুরা জানেন এই মূর্তি ঈশ্বর নন। ঈশ্বরের ওপর মনঃসংযোগ করার জন্য একটি মাধ্যম মাত্র এবং প্রতিমাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা। যেমন, একজন দেশভক্ত তার জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে, পৃথিবীর যেখানেই তাকে দেখতে পান না কেন।

সকলেই জানেন জাতীয় পতাকা একখণ্ড বস্ত্র এবং কিছু রঙ মাত্র, সেটি জাতি নয়। তবু জাতীয় পতাকার অসম্মান দেখলে একজন দেশভক্ত তার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে। জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন একপ্রকার মূর্তিপূজা। পাথরের মূর্তির নিকট কেউ প্রার্থনা করে না, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, সেই কারণেই সকল মন্ত্রের প্রারম্ভে প্রথমে ‘ওঁ’ উচ্চারণ করতে হয়। ‘ওঁ’ শব্দের অর্থ ‘‘ঈশ্বর সকলের চেয়ে মহৎ’’।

পূজার পরে হিন্দুরা মূর্তি বিসর্জন দেন। তাতে প্রমাণ হয়, মূর্তির কোনো গুরুত্বই নেই। মূর্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিমার ওপর মনোসংযোগ করাই মূর্তির একমাত্র উপযোগিতা। মূর্তিপূজা উৎসবের আনন্দ উপভোগ, জনসমাগম ও জনসংযোগের উপায়।

হিন্দুধর্ম যখন সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হল, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির পূজিত অনেক দেবতার মূর্তি হিন্দুধর্মের মূল উৎসব স্রোতের সঙ্গে মিশে গেল। তার ফলে অনেক মূর্তির পূজা হতে আরম্ভ করল। অবশ্য এই মূর্তিগুলির প্রভাব বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

উত্তর ভারতের হিন্দুরা মূর্তিকে বলেন দেবতা, ভগবানকে বলেন ঈশ্বর। আদি দেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। মহেশ্বরের পুত্র পূজিত হন কার্তিক নামে। অপরপক্ষে ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে তাঁদের পূজা হয় যথাক্রমে মূর্তি/বিগ্রহম/ঈশ্বর/ঈশ্বরাড়ু/ ভগবান বেঙ্কটেশ্বর / ভগবান বালাজী (বিষ্ণুঁ), মুরুগণ / সন্মুখ/ কুমার স্বামী (কার্তিকেয়) রূপে।

তবে হিন্দুরা সকলেই এক। তাঁরা সকলেই এক ও অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরই সকল কারণের কারণ।

অস্ত্রের ব্যবহারে অথবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে অতিমানবিক ক্ষমতার অতিরঞ্জিত বিবরণ দিয়ে কাহিনীকারগণ দেবতাদের সম্পর্কে নানা অলীক কল্পকথার সৃষ্টি করেছেন। অত্যুৎসাহী শিল্পী ও ভাস্করগণ তাঁদের বল্গাহীন কল্পনা অনুযায়ী দেবতাদের মূর্তির অতিপ্রাকৃত রূপদান করেছেন। দেবতারা সকলেই মনুষ্য ছিলেন, প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে কেউই ছিলেন না। প্রত্যেকেরই একটি করে মস্তক ও দুটি করে হস্ত ছিল।

হিন্দুমন্ত্রে তাঁর এই রূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে :

ॐ त्रिमस्तकानां ज्ञानम् एकशिरे अवस्थितं ।
चतुर्बाहुतुल्यबलं द्विहस्ते रोपितम् ॥
भक्तेच्छापूरणार्थं पुनः पुनः आविर्भूतम् ।
प्रणमामि तं हि ईश्वरप्रेरितदूतम् ॥

ওঁ ত্রিমস্তকানাং জ্ঞানম্ একশিরে অবস্থিতং
চতুর্বাহুতুল্যবলং দ্বিহস্তে রোপিতম্ ।
ভক্তেচ্ছাপূরণার্থং পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতম্
প্রণমামি তং হি ঈশ্বরপ্রেরিতদূতম্ ।

হে ঈশ্বর, তুমি পুনঃপুন মনুষ্যরূপী দেবতাদের প্রেরণ করেছ। দেবতারা অতিশয় জ্ঞানী এবং তাঁদের একটি মস্তকে তিনটি মস্তকের শক্তি। তাঁদের দুটি হাত এত শক্তিশালী যে মনে হয় চারটি হাত কর্মরত। আমরা সকলে ঈশ্বরের দূতদিগকে প্রণাম করি।

গত ২০০০০ বৎসরে হিন্দুরা পেয়েছেন অনেক দেবতা/ দেবদূত এবং তাঁদের গ্রহণ করেছেন আদি দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের অবতার রূপে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ — 'রাম', যাঁর জন্ম হয়েছিল ৫০০০ বৎসর আগে এবং 'কৃষ্ণ', যাঁর জন্ম হয়েছিল ৩৫০০ বৎসর আগে, তাঁরা উভয়েই বিষ্ণুর অবতার হিসাবে পূজা, প্রেম ও শ্রদ্ধার পাত্র। হিন্দু ঈশ্বরপ্রেমী, সবর্দা ঈশ্বরের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করেন। সেই সব সাধারণ হিন্দু যাঁরা বেদ এবং গীতা পাঠ করেননি, তাঁরা মূর্তি পূজা করেন। যাঁরা বেদ ও গীতার জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁরা জানেন ঈশ্বরই একমাত্র ভগবান। মানুষ যা কিছু তাঁকে দিতে পারে, ঈশ্বর তার সবই পাওয়ার অধিকারী। মূর্তি শুধুমাত্র তাঁর প্রতীক। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাই প্রকৃত ফলপ্রদায়ী।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে, কুড়ি নং শ্লোকে স্পষ্ট করে বলা আছে যে :

कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যয়ন্তেঅন্যদেবতাঃ
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য নিয়তাঃ স্বয়া ।

যাঁরা নিজ বিচারবুদ্ধি হারিয়েছেন এবং নিজ ইচ্ছা অনুসারে ভ্রান্তিবশে দেবদেবীর গুণাবলীর সমঝদার হয়েছেন তাঁরাই অজ্ঞতাবশে নানান দেবদেবীর মূর্তি পূজা করেন, যখন কিনা সর্বশক্তিমান নিরাকার ব্রহ্মের পূজাই একমাত্র লাভদায়ক।

বর্ণভেদ প্রথা

মধ্য এশিয়া থেকে আগত আক্রমণকারীরা হিন্দুদের উপর সামাজিক শোষণ ও নৈতিক ভ্রষ্টাচার কায়েম করার উদ্দেশ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রবর্তন করে। এর ফলে হিন্দুরা বিভক্ত হয় এবং দুর্বলও হয়ে পড়ে। এই আক্রমণকারীদের আগমনের পূর্বে সাধারণত শ্রমকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হত অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য।

যাঁরা শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদানের জীবিকা বেছে নিতেন তাঁদের বলা হত ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিদ্যায় যাঁরা পারদর্শিতা লাভ করতেন তাঁদের বলা হত ক্ষত্রিয়, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাঁরা বৈষয়িক সম্পত্তি সৃষ্টিতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁদের বলা হত বৈশ্য এবং কারিগর ও সাধারণভাবে শিল্পনৈপুণ্যের অধিকারীদের বলা হত শূদ্র। প্রত্যেকে নিজের নিজের পছন্দ বিশেষ জ্ঞান ও কুশলতা অনুযায়ী কর্মে লিপ্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ঋগ্‌বেদের যুগে একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতেন।

আনুমানিক ৪৫০০ থেকে ৩৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যাযাবর রক্তলোলুপ বিদেশী অশ্বারোহী সৈনিকেরা দলে দলে, বারে বারে স্বর্ণের লোভে ভারত আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা ভারতের শাসনভার দখল করে। নতুন শাসকেরা অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগকে চার প্রধান বর্ণে বিভাজিত করে। হিন্দুদের এর মাধ্যমে দুর্বল ও বিভক্ত জাতিতে পরিণত করা হয়।

এই চার শ্রেণী বিভাগের নাম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যারা শিক্ষিত ছিল না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশেষ কোনও রকম কুশলতা অর্জন করেনি, তাদের সম্পর্কে নতুন শাসকদের কোনও আগ্রহ ছিল না। তাদের বলা হয়েছিল নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করে নিতে হবে। হাজার বছরের রাজনীতির দলনের শিকার হল এই দুর্ভাগা সৎ মানুষেরা, আজও তাদের বলা হয় দলিত।

বৃত্তিভেদপ্রথা হয়ে গেল বর্ণভেদপ্রথা। বৃত্তিভেদ ছিল এক সমাজ ব্যবস্থা, যাতে সন্তান পিতার জ্ঞান ও কুশলতার উত্তরাধিকারী হত। সে-যুগে কারিগরি শিক্ষার কোনও বিদ্যালয় ছিল না, কাগজ ছিল না, বই ছিল না। পরিবারের বাইরে কুশলতা অথবা জ্ঞান অর্জন করবার কোনো রাস্তা ছিল না। বংশপরম্পরায়, কারিগরি কুশলতা ও জ্ঞান সঞ্চারিত হত। এক বৃত্তি থেকে অন্য বৃত্তিতে অর্থাৎ এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে

প্রবেশ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

হিংসাবৃত্তি দ্বারা আক্রমণকারীরা শান্তিপ্রিয় দেশ ভারতকে পদানত করল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয়দের নৈতিক সাহস ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল অটুট। আক্রমণকারীরা ভারতীয়দের মানসিকতার অবক্ষয় করতে পারল না। তখন তারা বর্ণভেদ প্রথার অপব্যবহার করে, অর্থনৈতিক শ্রমবিভাগকে তথাকথিত ধর্মীয় অনুশাসনে পরিবর্তিত করল এবং তাকে এমনভাবে পরিচালিত করল যেন বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে প্রাচীর অভেদ্য, যেন বর্ণভেদ একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা। অশিক্ষিত, অবুঝ মানুষ বহু শতাব্দী ধরে এই রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে বাস করতে করতে ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার হয়ে গেল।

বোঝা দরকার, পৃথিবীর সর্বত্র, কোনও সামাজিক অন্যায়, দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকলে, তা প্রায় আইনের বাধ্যবাধকতা লাভ করে। বৃত্তিভেদ বা বর্ণভেদপ্রথাকে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে অভেদ্য অনতিক্রমণীয় প্রাচীরে রূপান্তরিত করা হিন্দু সমাজের সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ।

চতুর রাজনীতিকেরা যুগে যুগে এই সামাজিক অন্যায়ের মোড়কে সমাজকে বিভক্ত করে অপশাসন ও সামাজিক শোষণ করেছেন। যাঁরা এর দ্বারা লাভবান হয়েছেন তাঁরা একে সমর্থন করেছেন।

সনাতন ধর্মের দর্শন যুগে যুগে হিন্দুদের প্রচণ্ড নৈতিক বল দান করেছে। হিন্দু দর্শন মানবতার শ্রেষ্ঠ দর্শন। এই দর্শন ঈশ্বর প্রেরিত তাই হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা আক্রমণকারীদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

আক্রমণকারীরা ছিল অশ্বারোহী, দ্রুতগামী, নৃশংস ও হত্যায় সিদ্ধহস্ত। যতটুকু সাফল্য তারা পেয়েছে , তা মৃত্যুভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে, শ্রদ্ধার মাধ্যমে নয়।

নতুন প্রভুরা ভণ্ড, মিথ্যাচারীদের সহায়তায় হিন্দুদের বিভক্ত ও দুর্বল করে রাখল। ভণ্ড অর্থাৎ যারা পঞ্চমবাহিনী, তারা ধার্মিক হিন্দু ও মানবতাবাদীর ছদ্মবেশে প্রকৃতপক্ষে সমাজকে ধ্বংস করে দিল, তাদের নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ, আত্মম্ভরিতা ও লোভকে চরিতার্থ করবার জন্যে, ক্ষমতাসীনদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে বহুবার বহুপথে তারা মানুষকে পথভ্রান্ত করেছে, নানা অজুহাতে বিদেশীদের সঙ্গে ভারতে এসে হিন্দুদের লুট করবার পথ প্রশস্ত করেছে।

বিপুল সংখ্যক দেশবাসী ছিল নিরক্ষর, অজ্ঞান, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী, অপরিসীম দারিদ্র্যে পীড়িত। কালক্রমে রাজসভায় নতুন শাসনকর্তাদের কায়েমি স্বার্থ গজিয়ে উঠল। স্বল্প পরিমাণ সম্পদ যা ছিল, হস্তগত করবার জন্যে প্রত্যেক

গোষ্ঠী প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে ‘নিজেদের লোক’ এবং ‘বাইরের লোক’, এই মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠল।

হাজার হাজার বৎসর ধরে এই অর্থনৈতিক বিভেদ বর্ণভেদপ্রথাকে এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত করল। এই শোষণকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে ভণ্ডেরা দুরভিসন্ধিপরায়ণ হয়ে একে ধর্মের বাহ্যিক রূপ দান করল। গীতায় পরিষ্কার বলা হয়েছে বর্ণ পেশাগত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মভেদ এবং মানুষের প্রবর্তিত কর্মবিভাগ। ঈশ্বর অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां च परंतप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै: ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরংতপ
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের এবং শূদ্রেরও উপাধি ভেদ হবে তাদের বৃত্তিগত গুণাবলীর প্রকাশ অনুযায়ী।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश: ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।

সমাজের চারটি শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করে তাদের প্রধান প্রধান গুণ এবং তা অনুযায়ী কর্তব্যের উপর এবং কর্ম এই অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ আমার মতো নশ্বর মানুষেরাই করেছে। এই শ্রেণী বিভাগ অমর ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়।

অন্যদিকে আমরা আবার দেখতে পাই মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের চার ভাই এক যক্ষের পুকুরে বিনা অনুমতিতে জলপান করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। যুধিষ্ঠির খুঁজতে এসে চার ভাইকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে যক্ষর কাছে প্রার্থনা করেন যক্ষ যেন চার ভাইকে জীবিত করে তোলেন। যক্ষ বলেন যে যুধিষ্ঠির যদি তার বারোটি ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবেই তিনি চার ভাইকে বাঁচাবার ওষুধ দেবেন। যুধিষ্ঠির সম্মত হলে যক্ষ বারোটি প্রশ্ন করেন —

राजन् कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रूतेन वा ।
ब्राह्मण्यं केन भवति प्रब्रह्येतत् सुनिश्चितम् ॥

(বনপর্ব ৩১৩ অধ্যায়, শ্লোক ১০৭)

"ব্রাহ্মণ হতে হলে কি একমাত্র জন্মসূত্রেই ব্রাহ্মণ হতে হবে? অথবা চরিত্রের সততা ও মাধুর্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় নাকি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অথবা প্রজ্ঞা লাভের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়"? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দেন —

शृणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम् ।
कारणं हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशय: ॥

(বনপর্ব ৩১৩ অধ্যায়, শ্লোক ১০৮)

"ব্রাহ্মণ হওয়া যায় সৎ মধুর চরিত্র গঠনের মাধ্যমে। জন্মসূত্র, জ্ঞান অর্জন বা প্রজ্ঞা কাউকে ব্রাহ্মণ করে না"।

এটা একটা ধর্মমত প্রমাণ যে ইচ্ছা, পরিশ্রম ও কর্মকুশলতার মাধ্যমে মানুষ বর্ণভেদ প্রথার ওপরে উঠে স্ব-ইচ্ছায় নিজ বর্ণপরিচিতি নিতে পারে।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসাধুতা দ্বারা উৎপন্ন জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্মের মত একটি নির্মল ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্মকেও প্রায় আবর্জনাস্তূপে পরিণত করেছে। হিন্দুরা পৃথগন্ন পরিবার হয়ে দাঁড়ায়। সনাতনধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্ম কোনও দিনই বর্ণভেদবাদের নির্দেশ দেয়নি। কিন্তু হিন্দুধর্মের ধর্মাবলম্বীরা বাধ্য হয়ে এবং অজ্ঞতাবশে বহু শতাব্দী ধরে তা পালন করে এবং ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেন যে, বর্ণভেদ প্রথার অনুসারীরা দরিদ্র, দুর্বল এবং দাস হয়ে থাকবে।

কথিত আছে, ঈশ্বর বিধান দিয়েছেন, যে কেউ বর্ণভেদপ্রথা অস্বীকার করে হিন্দুদের ঐক্যের জন্যে চেষ্টা করবেন, তিনি অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হবেন, তাঁর উত্তরসূরী পূর্বপুরুষেরাও স্বর্গবাসী হবেন।

বর্ণভেদপ্রথা যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অস্ত্র, ধর্মীয় বিধান নয়, তার বহু প্রমাণ আছে। বঙ্গ দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এক শক্তিশালী নরপতি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বল্লাল সেন। তাঁর রাজত্বকালে নাথ ব্রাহ্মণ (তাঁদের রুদ্র ব্রাহ্মণও বলা হত) ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চবর্ণ বলে পরিগণিত হতেন এবং রাজপুরোহিত হিসাবে কাজ করতেন।

পীতাম্বর নাথ ছিলেন রাজা বল্লাল সেনের রাজপুরোহিত, বল্লাল সেনের পিতার যখন মৃত্যু হয়, রাজা চাইলেন তাঁর গুরু পীতাম্বর নাথ মৃতের পিণ্ড গ্রহণ করুন রাজার দান হিসাবে।

পীতাম্বর নাথ কোনও মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই প্রত্যাখ্যান রাজা অপমান জ্ঞান করেন এবং আহত আত্মাভিমানে ও ক্রোধে শ্রীপীতাম্বর নাথের উপবীত কেড়ে নিয়ে বঙ্গরাজ্যে প্রচার করলেন রুদ্রজ ব্রাহ্মণ / নাথ ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ) বলে গণ্য ব্যক্তিরা এরপর থেকে শূদ্র হিসাবে গণ্য হবেন। তার ফলে তদবধি রুদ্রজ/নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা বঙ্গ দেশে শূদ্র হিসাবে গণ্য হন এবং বঙ্গ-দেশের বাইরে সেই একই নাথেরা ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিসাবে শ্রদ্ধার পাত্র। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণ হয়, বর্ণভেদ প্রথা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়, চতুর রাজনীতিকদের দ্বারা কৃত রাজনৈতিক শোষণ। পুরাণে অর্থাৎ প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত আছে যে, নাথ ব্রাহ্মণেরা (অর্থাৎ রুদ্র বাহ্মণ) ভগবান শিব, যিনি রুদ্র নামেও অভিহিত তারই বংশধরগণ। নেপালে (যেটি একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র) এখন পর্যন্ত রাজপুরোহিত একজন নাথ ব্রাহ্মণ। কলকাতায় বিখ্যাত কালী মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ছিলেন শ্রীচৌরঙ্গী নাথ। কলকাতায় একটি প্রধান রাজপথের নামকরণ হয়েছিল তাঁর স্মৃতিতে। সেটি চৌরঙ্গী রোড নামে পরিচিত ছিল। অন্য বিখ্যাত নাথেরা ছিলেন সোমনাথ, গোরখনাথ প্রভৃতি, যাঁদের স্মৃতিতে যথাক্রমে বিশাল সোমনাথ মন্দির (গুজরাট) এবং গোরখনাথ মন্দির (উত্তর প্রদেশ) নির্মিত হয়। এই সব তথ্য আবার প্রমাণ করে যে, বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, কর্মবিতরণ ও রাজনৈতিক শোষণ থেকে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী।

ইতিহাস বলে ভারতে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা বহু ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই জীবিকা অর্জনের জন্য কারিগরের বৃত্তি অবলম্বন করতেন। ময়ূরশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ যোদ্ধার বৃত্তি গ্রহণ করে প্রসিদ্ধ হন এবং কদম্ব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আরেকজন ব্রাহ্মণ, মাতৃবিষ্ণু , ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে একটি প্রদেশের শাসক হন। প্রদোষ বর্মন জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর বৃত্তি ছিল ক্ষত্রিয়ের এবং তিনিও একটি প্রদেশের শাসক হয়েছিলেন। গুপ্তযুগে অনেক ব্রাহ্মণ বনে জঙ্গলে শিকারীর কাজ করতেন কারণ তা ছিল অর্থকরী পেশা। শূদ্র বংশজাতরা মান্ডাশোরের বিখ্যাত সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন। এই সব দৃষ্টান্ত প্রমাণ

করে যে হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদপ্রথা কেবলমাত্র শ্রমবিভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বৈদিক যুগে শূদ্র অথবা অন্য কাউকে অস্পৃশ্য অথবা দলিত জ্ঞান করার ধারণা প্রচলিত ছিল না। কাউকে ঘৃণ্য মনে করা হত প্রধানত তার বৃত্তি এবং ব্যবহার সমাজে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে। তবে, সমাজে নিন্দিত অবস্থা অনুশোচনা দ্বারা অথবা বৃত্তি পরিবর্তনের দ্বারা সংশোধিত করে নেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন যুগে ছাত্রাবস্থা দীর্ঘকাল ব্যাপী ছিল এবং আশ্রমে বনবাসের মতো কঠোর জীবনযাপন করতে হত। গুরু-শিষ্যের মধ্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান হত। সাধারণত শিক্ষা দান করা হত মৌখিকভাবে কারণ লিখিত পুথি সহজলভ্য ছিল না।

পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য পরিবারের সন্তানদের (পারিবারিক বৃত্তি অথবা ব্যবসায়ের স্বাভাবিক সংস্পর্শের কারণে) একটা পারিবারিক কর্মের প্রবণতা প্রথম থেকেই তৈরি হত এবং পিতামাতারা সহজেই তাঁদের বংশ পরম্পরাগত বৃত্তিতে প্রবেশ করিয়ে নিতে পারতেন।

কালক্রমে বৃত্তি নির্বাচনের এই প্রথা অজ্ঞাতসারেই সম্পূর্ণ পরিবারভিত্তিক বৃত্তির কারণ হল; যদিও সমাজ সে-রকম পরিণতির আকাঙ্ক্ষা করেনি। এই বিষয়ে হিন্দুসমাজে কঠোরতা ছিল না। কে কী বৃত্তি অবলম্বন করবে তাতে তার স্বাধীনতা ছিল। (যেমন, সত্যকাম জন্মসূত্রে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু বেদাধ্যয়ন করে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে বিপুল শ্রদ্ধা অর্জন করেন।) বৈদিক যুগে যে-কেউ পুরোহিত হতে পারতেন। ব্রাহ্মণের জন্য সে পদ সংরক্ষিত রাখার কোনও প্রশ্ন ছিল না।

पवित्रात्मा संयतेन्द्रिय: पेशलां मधु जीऔवा च
तं गुरुं श्रद्धया श्रृणु उपहार च प्रयच्छतु ॥

পবিত্রাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ পেশলাং মধু জীঔবা চ
তং গুরুং শ্রদ্ধয়া শৃনু উপহার চ প্রয়চ্ছতু ।

যার অন্তর পবিত্র, প্রবৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণের অধীন এবং সুরসংযোগে যিনি শ্লোক আবৃত্তি করতে পারেন, তিনিই পুরোহিত হিসাবে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে প্রার্থনা পরিচালনা করবার অধিকারী এবং তাঁকে ভক্তগণের প্রভূত পরিমাণ দান করতে হবে যেন তিনি স্বচ্ছন্দ ও উন্নত পারিবারিক জীবন যাপন করতে পারেন।

বৃত্তি বিবেচনায় বিবাহ একই বর্ণের মধ্যে হওয়া সুবিধাজনক বিবেচনা করা হত, একই ধরনের পারিবারিক পরিবেশ থেকে আসার কারণে পরিবারের ব্যবসায়ে

প্রবেশ করতে দেরি হত না, অসুবিধা হত না এবং অতিরিক্ত কোনও শিক্ষানবিশির প্রয়োজন হত না। উপরন্তু এই ধরনের বিবাহের ব্যবস্থায় বর ও কন্যার বিবাহের পরে অপ্রত্যাশিত, অপরিচিত, অমিত্র-সুলভ ও অবাঞ্ছিত সামাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকত।

যাদের মধ্যে পারিবারিক পরিবেশের দিক থেকে বিপুল পার্থক্য ছিল এমন পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহও হতে পারত এবং প্রায়ই ঘটত। মহাভারতের ইতিহাস বলে এক শূদ্র ধীবরের কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা শান্তনুর বিবাহে সমাজ কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি।

বর্ণভেদপ্রথা ছিল এক অর্থনৈতিক প্রথা। কাজের সুবিধার জন্য লোক তাদের পারিবারিক বৃত্তিই অবলম্বন করে থাকত এবং একই ধরনের পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ একই ধরনের বৃত্তির লোকের মধ্যে সাধারণত বিবাহ হত। এই বিষয়ে সাম বেদের একটি শ্লোক প্রাসঙ্গিক: ঈশ্বর শোষণ পছন্দ করেন না। তিনি চান তাঁর ভক্তেরা সকলের সঙ্গে সমব্যবহার করুন, পীড়িতের সেবা করুন।

यो ददाति बुभूक्षितेभ्य: पीडितानां सहायक:
दु:खार्ताणां समाश्लिष्यति तमेव ईश: प्रसीदति ॥

যো দদাতি বুভূক্ষিতেভ্যঃ পীড়িতানাং সহায়কঃ
দুঃখার্তাণাং সমাশিলষ্যতি তমেব ঈশঃ প্রসীদতি।

ঈশ্বর খুশি হন, যখন তুমি সমব্যবহারের মাধ্যমে কোনও মানুষের চিত্ত আনন্দিত কর, ক্ষুধার্তকে অন্নদান কর, আর্তকে সাহায্য কর, দুঃখীর দুঃখভার লাঘব কর, অত্যাচারিতের প্রতি অন্যায় আচরণের অবসান কর।

হাজার বৎসর ব্যাপী বিদেশী দাসত্বের পর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে, সামাজিক ভেদনীতি অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথা নির্মূল করার অধিকার লাভ করে। দীর্ঘকাল বর্ণের ভিত্তিতে যারা বঞ্চিত হয়ে এসেছে তাদের জন্যে ভারত সরকার চাকরিতে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জাতিভেদ প্রথা ভারতে আইনত দণ্ডনীয়, আধুনিক শিক্ষিত ভারতীয় জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করে এবং এই বিষয়ে আলোচনা হলে লজ্জিত হয় ও অপ্রতিভ বোধ করে।

মনুস্মৃতি

আনুমানিক ৩৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একদল আক্রমণকারী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে এসে এ দেশ জয় করে নেয়। তাঁরা শুধু যে অধিবাসীদের আধিভৌতিক জীবনকেই নিজেদের অধীনে নিয়ে আসে তা নয়, সংস্কৃতির উপরও তারা আক্রমণ চালাতে চায়। এমন কি বেদ-এর ওপরেই তারা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। বেদ ধর্মীয় ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, সামাজিক আচার-আচরণে জীবনযাত্রার পথে আলোকসম্পাত করে ভারতীয়দের পথ প্রদর্শন করত এবং একেশ্বরবাদী ছিল। বলপূর্বক তাকে পারসিক সূর্য এবং ইন্দ্র-উপাসনা এবং বলিদানের ধর্মীয় রীতির সঙ্গে মিশ্রিত করে দেওয়া হয়। মুনি-ঋষিরা অনেকে দক্ষিণ ভারতে পলায়ন করেন, হিমালয়ের গুহাকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পারস্য এবং এশিয়া মাইনর থেকে আগত শাসকগণ সমাজকে বিভক্ত করে তাকে দুর্বল এবং পদানত করে নিজেদের রাজকার্যে ব্যবহার করতে চায় ।

পরে আনুমানিক ৩২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মনু (অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি জার্মান বংশোদ্ভূত ছিলেন) সামাজিক কর্ম-বিভাগের এক কঠোর বিধানের প্রবর্তন করেন এবং তার নাম দেন মনুস্মৃতি। মনু নিজে এক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং দক্ষ গণিতজ্ঞ এবং আইন বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বেদই সনাতন ধর্ম (অর্থাৎ হিন্দুধর্ম), মনুস্মৃতির উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসনকে সাহায্য করা। হিন্দুদের উপলব্ধি করা উচিত, মনুসৃষ্ট সামাজিক ভেদ তাদের কীভাবে বিভ্রান্ত করেছে, তবে, গণিতের ক্ষেত্রে মনুর অবদান অত্যুজ্জ্বল এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যবান।

মনু আইন সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা, তার নাম মনুস্মৃতি। মনু শব্দের অর্থ 'মানুষ', আর কিছু নয়। 'মনু'-তে সম্ভবত একটি সুপ্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ধারার প্রতিফলন আছে, যদিও এমনও সম্ভব যে 'মনু' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে সমান্তরাল পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে, যেমন হিব্রুশব্দ *'Adam'* (তারও অর্থ মানুষ)। বেদোত্তর যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ বর্ণিত আছে যে একটি মৎস্য, মনু যাঁর একটি উপকার করেছিলেন, কীভাবে মনুকে এই বলে সাবধান করে দেন যে, একটি বন্যায় মানবজাতির এক বিশাল অংশ বিনষ্ট হবে। তাই মনু মৎস্যটির পরামর্শ অনুযায়ী এক নৌকা নির্মাণ করেন এবং যখন বন্যা এল, তিনি নৌকাটি

মৎস্যটির শৃঙ্গের সঙ্গে বেঁধে দিলেন এবং নিরাপদে এক পর্বতের শিখরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। পুরাণে কথিত আছে মৎস্যটি বিষ্ণুর এক অবতার।

পরবর্তী কালের হিন্দুধর্মে পুরাণাদিতে এবং মনুস্মৃতিতেও বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত জল্পনা-কল্পনার আগ্রহে বলা হয়েছিল, চতুর্দশজন মনু ছিলেন, ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসরের কল্পের অর্ন্তগত, ১৪টি যুগের প্রত্যেকটির জন্যে একটি করে মনু। মন্বন্তর অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগ বর্তমান কল্পের সপ্তম যুগ। চতুর্দশ মনুর পরে সমগ্র পৃথিবী তার বিধিলিপি অনুযায়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তারপরে আসবে নতুন সৃষ্টি, সৃষ্টি ও বিনাশের এক অন্তহীন চক্র। তবে ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্তকাল বিদ্যমান।

মনুস্মৃতি (মনুর আইন কিংবা আচার-সংহিতা) যার যথাবিহিত নাম মানবধর্মশাস্ত্র, আইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ। এতে জোর দেওয়া হয়েছে রাজা কর্তৃক স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রাজ্য পরিচালনার ওপর। দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের একটি রূপরেখা ছাড়া এতে আছে জীবনের চারটি পর্বের কথা। ছাত্রজীবন, গার্হস্থ্য জীবন, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। বিদেশীরা কর্মবিভাগের অনুচিত প্রয়োগ করেছিল জাতিকে বিভক্ত ও দুর্বল করার উদ্দেশ্যে। বৃত্তির বিভাজন সামাজিক বিভাজনে রূপান্তরিত হয় এবং তার বিকৃত রূপ সামাজিক শ্রেণী (বর্ণ), বর্ণবিভেদের এক ঐতিহাসিক ভিত্তি। অতএব ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে তথ্যের একটি মূল্যবান সূত্র মনুস্মৃতি। মনুস্মৃতি হিন্দুদের হীনবল করেছে, মনুস্মৃতিকে বেদ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব দানের শাস্তিস্বরূপ ভারত বিদেশীদের পদানত হয়েছে। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম ও গীতার শিক্ষা অনুযায়ী বর্ণভেদ এক অন্যায় ও অপরাধ। কখনও কখনও নিজেদের অজ্ঞাতসারেই লোকে বর্ণভেদ পালন করে। অনেক রাজনীতিক এখনও নিজেদের দলগত স্বার্থের জন্যে মনুস্মৃতির ব্যবহার করেন, দেশকে বিভক্ত ও দুর্বল করে রাখবার জন্যে। তাঁরা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু।

উপনিষদ

উপনিষদগুলি (১৬০০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ) প্রাচীন ভারতীয় রচনা, অপার্থিব বিষয় এবং মোক্ষলাভের নীতি ও পন্থা সম্পর্কে জ্ঞান পোষণের উদ্দেশ্যে লিখিত। বৈদিক ধারায় সর্বশেষ পর্যায় এই উপনিষদগুলোর মধ্যে প্রতিবিম্বিত, সেই কারণে সেগুলির মধ্যে চিন্তার যে বিকাশ আমরা দেখতে পাই তা বেদান্ত নামে পরিচিত। প্রাচীনতর অধিকাংশ উপনিষদ বেদের শেষ পর্যায়ের থেকে বিকশিত। আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবন সম্পর্কে দার্শনিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকারের মনোভাবই উপনিষদগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্‌বেদের শেষের দিকের স্তোত্রগুলির গূঢ় তাৎপর্য উপনিষদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উপনিষদের আলোচ্য বিষয়, ব্যক্তির আত্মা যে বিশ্বের আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, এই উপলব্ধি সরলভাবে প্রকাশ করা। সেই অভিন্নতার নির্যাস 'তত্ত্বমসি' ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যে সুন্দরভাবে বলা আছে। 'কঠোপনিষদ'- এ আলোচনার বিষয় অনন্ত জীবনের প্রকৃতি। অন্যান্য আলোচ্য বিষয় যেমন 'আত্মার দেহান্তর' অবলম্বন এবং 'মায়ার তত্ত্ব' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে লেখা হয়েছে।

উপনিষদের রচনাগুলি সাধারণত অতি সংক্ষিপ্ত। সেগুলিতে দার্শনিক চিন্তার সংক্ষিপ্তসার, উপদেশমূলক কাহিনী কথোপকথনের মাধ্যমে, সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য আকারে পরিবেশিত হয়েছে। বৈদিক উপনিষদগুলির সংখ্যা ৪৩, অবশিষ্ট প্রায় ১০০টি উপনিষদ সম্ভবত বেদোত্তর, যদিও বেদ-প্রভাবিত দেবতাদের মূর্তি কল্পনা করে কবি, লেখক এবং শিল্পীরা যে সব নীতিমূলক কাহিনী ব্যবহার করেছেন তাতে অনেক ক্ষেত্রে দেবতাদের বহু হস্তবিশিষ্ট এবং বিবিধ অস্ত্রধারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, তাঁদের সমরকুশলতার উপর জোর দেওয়ার জন্য। দেবতারা বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এক মাথা ও দ্বিহস্তেরই অধিকারী ছিলেন। জনগণের ভক্তিভাব উদয় করার জন্য তাঁদের অলৌকিক রূপ দিয়েছেন শিল্পীরা।

ॐ त्रिमस्तकानां ज्ञानम् एकशिरे अवस्थितं ।
चतुर्बाहुतुल्यबलं द्विहस्ते रोपितम् ॥
भक्तेच्छापूरणार्थं पुनः पुनः आविर्भूतम् ।
प्रणमामि तं हि ईश्वरप्रेरितदूतम् ॥

ওঁ ত্রিমস্তকানাং জ্ঞানম্ একশিরে অবস্থিতং
চতুর্বাহুতুল্যবলং দ্বিহস্তে রোপিতম্ ।
ভক্তেচ্ছাপূরণার্থং পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতম্
প্রণমামি তং হি ঈশ্বরপ্রেরিতদূতম্ ।

জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল ও বিষ্ণুর দশ অবতার

<table>
<tr><th>কল্প</th><th>উপ কল্প</th><th>যুগ</th><th>অযুত বছর *</th><th></th></tr>
<tr><td rowspan="7">সেনোজোয়িক</td><td rowspan="2">কোয়াটারনারি</td><td>হলোসিন</td><td>০.০১১৫ - ০.০০</td><td>ভগবান বুদ্ধ, শ্রী কৃষ্ণ ও শ্রীরাম অবতার</td></tr>
<tr><td>প্লাইস্টোসিন</td><td>১.৮১ - ০.০১১৫</td><td>পরশুরাম অবতার</td></tr>
<tr><td rowspan="5">টার্শিয়ারি</td><td>প্লাইয়োসিন</td><td>২.৫৯ - ৩.৬০</td><td>বামন অবতার</td></tr>
<tr><td>মাইয়োসিন</td><td>৭.২৫ - ২০.৪</td><td rowspan="2">নৃসিংহ অবতার</td></tr>
<tr><td>অলিগোসিন</td><td>২৩.৪ - ২৮.৪</td></tr>
<tr><td>ইয়োসিন</td><td>৩৭.২ - ৪৮.৬</td><td rowspan="2">বরাহ অবতার</td></tr>
<tr><td>প্যালিয়োসিন</td><td>৫৮.৭ - ৬১.৭</td></tr>
<tr><td rowspan="3">মেসোজোয়িক</td><td colspan="2">ক্রিটেশিয়াস</td><td>৭০.৬ - ১৪০</td><td rowspan="4">রূপান্তর দশা / পর্যায়</td></tr>
<tr><td colspan="2">জুরাসিক</td><td>১৫১ - ১৯৭</td></tr>
<tr><td colspan="2">ট্রায়াসিক</td><td>২০৪ - ২৫০</td></tr>
<tr><td rowspan="6">প্যালিয়োজোয়িক</td><td colspan="2">পার্মিয়ান</td><td>২৫৪ - ২৯৫</td></tr>
<tr><td colspan="2">কার্বনিফেরাস</td><td>৩০৪ - ৩৪৫</td><td>কূর্ম অবতার</td></tr>
<tr><td colspan="2">ডিভোনিয়ান</td><td>৩৭৫ - ৪১১</td><td rowspan="2">মৎস্য অবতার</td></tr>
<tr><td colspan="2">সিলুরিয়ান</td><td>৪১৯ - ৪৩৯</td></tr>
<tr><td colspan="2">অর্ডোভিশিয়ান</td><td>৪৪৬ - ৪৭৯</td><td rowspan="5">ব্রহ্মকল্প</td></tr>
<tr><td colspan="2">ক্যাম্ব্রিয়ান</td><td>৪৯৬ - ৫৩৪</td></tr>
<tr><td rowspan="3">প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান</td><td colspan="2">প্রোটেরোজোয়িক</td><td>৬৩০ - ২৩০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">আর্কিয়েন</td><td>২৮০০ - ৩৬০০</td></tr>
<tr><td colspan="2">হেডিন</td><td>৩৮৫০ - ৪১৫০</td></tr>
</table>

** ১ অযুত বছর = ১০ লক্ষ বছর*

বিষ্ণুর দশ অবতার চক্র

হিন্দু দর্শনে 'দশাবতার' চক্রর মাধ্যমে যে দশজন অবতারকে (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি) সাজানো হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ক্রমবিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বহু যুগ আগে সূর্য থেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সূর্যের কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মহাশূন্যে সেই বিচ্ছিন্ন অংশ বহু বছর আবর্তিত হতে হতে ঘনীভূত ও শীতল হয়ে তৈরি হয় পৃথিবী গ্রহ। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী ছিল জলময়। সেই জলের প্রথম প্রাণীই হল মীন বা মৎস্য (প্যালিয়োজোয়িক কল্পের সিলুরিয়ান-ডিভোনিয়ান যুগকেই মৎস্য যুগ বলে)। এই সময় ভগবান, মীনরূপে বেদোদ্ধার করেছিলেন। এই বেদ কিন্তু গ্রন্থ নয়, সৃষ্টি জ্ঞান। তখন সে পারঙ্গম হয়েছে বংশরক্ষায়, যা ছিল সে যুগের জীবনবেদ। মন্ত্র ছিল — *গোত্রং নো বর্ধতাম্* ।

এলেন দ্বিতীয় অবতার — কূর্ম। জল ছেড়ে সে ডাঙ্গায় উঠতে শিখেছে অর্থাৎ উভচর প্রাণী; শিখেছে বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে (ডিভোনিয়ান-কার্বনিফেরাস যুগ)। কূর্ম, জল থেকে কাদা মেখে ডাঙ্গায় উঠে এল — এটাই হল তার ধরণী-ধারণ।

তৃতীয় অবতার — বরাহ। সে এখন ডাঙ্গার প্রাণী হলেও জলের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি— বাস করে কাদায়। বিবর্তিত হয়েছে স্তন্যপায়ী জীবে — শিখেছে সন্তান প্রসব করতে (সেনোজোয়িক কল্পের প্যালিয়োসিন-ইয়োসিন যুগ), স্বভাবগত ধর্মই হল দন্তাঘাতে মৃত্তিকা বিদারণ।

চতুর্থ অবতার — নৃসিংহ (অর্ধেক পশু আর অর্ধেক মানুষ) অর্থাৎ রূপান্তর পর্যায় (যেমন আধুনিক শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ইত্যাদি)। (অলিগোসিন-মাইয়োসিন যুগ)। ভগবান নৃসিংহ, হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যকে নখ-তাড়নে বিনাশ করেছিলেন। বিবর্তনের পথে এক বিশেষ প্রতিকূল শক্তি, প্রকৃতির স্বাভাবিক গ্রাসাচ্ছাদন নষ্ট করত। এই গ্রাসাচ্ছাদন হল বনজাত কদলী। সেই কলাগাছের শত্রু এক ধরনের কেঁচো (কলাগাছ সাধারণত আর্দ্র জায়গায় জন্মায় বলেই কেঁচোর উপদ্রব বেশি)। এই কেঁচোর নাম হিরণ্যকশিপু। নরহরি তার নখ-তাড়ণে কেঁচোগুলোকে ধ্বংস করে ভাবী মনুষ্য প্রজাতির জীবন ধারণের আদি খাদ্যকে সংরক্ষিত করেন (আজও শিম্পাঞ্জি, বেবুন, ওরাংওটাং প্রভৃতি প্রাণীরা কেঁচো জাতীয় কীটের স্বভাব শত্রু।

এরা প্রধানত নিরামিষাশী হলেও সকলেই অল্পবিস্তর কীট-ভুক)। কলা মানুষের অন্যতম আদি খাদ্য, তাই আজও এই পরম উপকারী কলাগাছ হিন্দুদের সব রকম মাঙ্গলিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

এরপর এলেন পঞ্চম অবতার — বামন — হুবহু রামাপিথেকাস, অর্থাৎ হমোগণের শুভ আবির্ভাব (প্লাইয়োসিন যুগের কথা)। মাঝে মাঝে সে দু পায়ে উঠে দাঁড়ালেও চলতে গেলে অল্পবিস্তর হাতের সাহায্য লাগে, উচ্চতায় সে বর্তমান মানুষের অর্ধেক।

এরপর ষষ্ঠ অবতার, এলেন পূর্ণ মানুষের রূপ নিয়ে পরশুরাম — তাঁর শ্রীকরে পরশু বা কুঠার। তিনি দৈহিক ক্ষমতাবলে ক্ষাত্রধর্মী নন, তাঁর শক্তি মস্তিষ্কবল — তাই ব্রাহ্মণ। তিনি আগুনের ব্যবহার জানেন — তাই অগ্নিহোত্রী। ভগবান পরশুরাম সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনকে নিধন করেন, একুশবার ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করেন; আর আপন গর্ভধারিণী মাতা রেণুকাকে কুঠারাঘাত করেছিলেন। মানুষের সহস্রবাহু হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রজাত অর্জুন গাছ সে তো মহীরুহ। তার সহস্র বাহু বা শাখাপ্রশাখাকে কুঠারের আঘাতে ছেদন করে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় (জঙ্গল পরিষ্কার) করে তিনি মানুষের বসবাসযোগ্য জমি তৈরি করেছিলেন। আর কৃষির প্রথম প্রচেষ্টা স্বরূপ মাতা ধরিত্রীর বুকে কুঠারাঘাত করে মাটি রেণু রেণু করেছিলেন। এতদিনে পাশবিক যুগের অবসানান্তে দেখা দিল — মানব সভ্যতার অরুণালোক। পরশুরামের প্রধান অস্ত্র কুঠার।

এরপর আবির্ভূত হন সীতাপতি শ্রীরাম। তিনি ধর্নুবাণধারী। এই দূরক্ষেপী অস্ত্রের কাছে পরশুরামের কুঠারের অনুপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় — দর্পচূর্ণ হল পরশুরামের। পুরাতনকে চিরবিদায় নিতে হল। এক রাম জঙ্গল পরিষ্কার করে রেখেছিলেন, আর এক রাম সেখানে শুরু করলেন নতুন আবাদ — মানবিকতার। দেখা দিল স্থায়ী জনপদ - রাজ্য - গোষ্ঠিপতি, এলেন রাজা। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম বিবর্তিত হলেন ধনুর্ধর শ্রীরামে। এই যুগেই আবার দ্বিতীয় দফায় উন্নততর কৃষি ব্যবস্থার প্রচেষ্টা শুরু হল — এ হল তাঁর 'অহল্যা উদ্ধার' (হলের সাহায্যে অস্পৃষ্ঠ অর্থাৎ অনাবাদী জমির উদ্ধার)। আর তাঁর সীতাপতি নামটাও সার্থক, কারণ সীতা অর্থে লাঙ্গলের ফলা। এই হল জ্ঞানময় রূপ। মিথিলার জনকরাজ কৃষিকাজে সীতা (লাঙ্গলের ফলাকে বলা হয় সীতা) আবিষ্কার করেন। কিন্তু জনকরাজের আবিষ্কৃত লাঙ্গলের ফলা অর্থাৎ সীতাকে বহুল প্রচার এবং ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দু জনমানসে জীবনদায়ী মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরাম। অর্থাৎ মাতা যেমন সন্তানের জীবন রক্ষা

করেন তেমনই কৃষিপ্রধান ভারতের জনসমূহকে লাঙ্গলের বহুল প্রচারের মাধ্যমে শ্রীরাম জীবন ধারণের পথ প্রদর্শন করলেন এবং জনমানষে হলেন বিষ্ণুর সপ্তম অবতার।

কাটল আরও বহু বছর, এলেন ভগবান কৃষ্ণ। কৃষি সভ্যতার পূর্ণ প্রকাশ হল। বৈদিক আরণ্যক সভ্যতা আর পৌরাণিক কৃষি সভ্যতা। ফলে কৃষি পেল পূর্ণতা, জ্ঞানের হল চরমোৎকর্ষ — নরদেহেই এ যুগে আবির্ভূত হলেন পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তারপর শুরু হল ঐতিহাসিক যুগ, আবির্ভূত হলেন নবম অবতার — সিদ্ধার্থ গৌতম বা বুদ্ধদেব। মাত্র তিনটে কথায় বলে গেলেন জীবনের অমৃত মন্ত্র — অহিংসা পরম ধর্ম। এতদিনে জ্ঞানময় পূর্ণতা লাভ করে — আনন্দময় রূপে।

বিষ্ণুর দশম অবতার হলেন কল্কি। ভবিষ্যবাণী হল যে কল্কি থার্মোনিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবসমাজের দুঃখ দুর্দশা দূর করবেন।

দশাবতার ধারিণে কৃষ্ণায় তুভ্যম্ নমঃ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''উপনিষদের প্রতি পাতায় আমাকে যার কথা বলা হয়েছে তা হল সাহস। এইটিই সবচেয়ে মনে রাখবার কথা। আমার জীবনে এই একটি বড়ো শিক্ষাই আমি নিয়েছি। হে মানুষ! বীর্যবান হও, দুর্বল হোয়ো না!''

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ''জাতি হিসাবে আমরা যা কিছু পেয়েছি সবই আমাদের দুর্বল করেছে। মনে হয় সেই সময় জাতির জীবনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল, কী করে আমাদের দুর্বল থেকে দুর্বলতর করা যায়। শেষ পর্যন্ত আমরা কেঁচোতে পরিণত হয়েছি, যে কেউ তরবারি দেখিয়ে আমাদের পদানত করেছে তার পায়ের তলায় থাকবার জন্যে।

''আমি যা চাই তা হল লৌহনির্মিত পেশী এবং স্বাস্থ্য। শক্ত ধাতুতে নির্মিত মন। পৌরুষের পূজা করো।

''সব শক্তি তোমার মধ্যে আছে। তুমি সব কিছু করতে পার, তা বিশ্বাস করো, ভেবো না তুমি দুর্বল। তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার, কারও নির্দেশ ছাড়াই। সব শক্তি তোমার মধ্যে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে তোমার ভিতরকার দেবত্বকে প্রকাশ করো।

''তোমার দেশ বীর চায়, বীর হও। পাহাড়ের মত দৃঢ় হও। সর্বদা জয়ী হও, দেশের লোক যা চায় তা হল জাতির ধমনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ, দেশের মধ্যে প্রাণশক্তি জাগিয়ে তুলতে হবে। সাহসী হও, মৃত্যু একবারই আসে। হিন্দুদের ভীরু হলে চলবে না। ভীরুতা আমি ঘৃণা করি। মনে গভীর শান্তি বজায় রাখো। তোমার বিরুদ্ধে বালখিল্যেরা কী বলল তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করো না। অগ্রাহ্য করো! অগ্রাহ্য করো! অগ্রাহ্য করো! সমস্ত বড়ো বড়ো কীর্তিই স্থাপিত হয়েছে বিশাল বিশাল বাধা অতিক্রম করে। পুরুষ ব্যাঘ্রের মত চেষ্টা করো।

''বন্ধু, ক্রন্দন করছ কেন? সমস্ত শক্তি তোমার মধ্যেই আছে, তোমার সর্বশক্তিমান স্বভাবকে জাগ্রত করো। তা হলে সমগ্র বিশ্ব তোমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। মুর্খরা কাতরস্বরে বলে, ''দুর্বল আমরা দুর্বল''। জাতি চায় কাজ এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। আমাদের প্রয়োজন মহৎ আত্মা, প্রবল শক্তি এবং অসীম উৎসাহ। উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মীলাভ হয়। পিছনে তাকানোর প্রয়োজন নেই, আমরা চাই অসীম

প্রাণশক্তি, অসীম উৎসাহ , অসীম সাহস, এবং ধৈর্য। একমাত্র তাহলেই বড়ো কিছু সাধিত হতে পারে।

''বেদ কোনও পাপ স্বীকার করে না, একমাত্র ভুল স্বীকার করে। বেদের মতে সব চেয়ে বড়ো ভুল এ কথা বলা যে তুমি দুর্বল, তুমি পাপী, এক হতভাগ্য জীব, তোমার কোনও শক্তি নেই, তুমি এই কাজ, কি ওই কাজ করতে পারবে না।

''শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, শক্তি সুখ, জীবন অনন্ত মৃত্যুহীন। দুর্বলতা সর্বক্ষণের কষ্টভোগ, দুর্বলতা মৃত্যু। সদর্থক মনোভাবসম্পন্ন হও, শক্তিশালী হও। শৈশব থেকেই এমন সব চিন্তা তোমার মস্তকে প্রবেশ করুক যে চিন্তা সহায়তাকারী। দুর্বলতাই দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুঃখভোগ করি, কারণ আমরা দুর্বল। আমরা মিথ্যা বলি, চুরি করি, খুন করি, অন্যান্য অপরাধ করি তার কারণ আমরা দুর্বল, আমরা যন্ত্রণা পাই কারণ আমরা দুর্বল। আমাদের মৃত্যু হয় কারণ আমরা দুর্বল। যেখানে দুর্বলতার কারণ নেই, সেখানে মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, একমাত্র প্রয়োজন শক্তি। শক্তি জগতের ব্যাধির ঔষধ। প্রবলের দ্বারা অত্যাচারিত দুর্বলের ঔষধ শক্তি। বিদ্বানের দ্বারা অত্যাচারিত অজ্ঞ ব্যক্তির ঔষধ শক্তি। এক পাপী যখন অন্য পাপীর দ্বারা অত্যাচারিত হয় তার ঔষধ শক্তি। উঠে দাঁড়াও, সাহসী হও, শক্তিমান হও, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে নাও এবং জানো, যে তুমি তোমার ভাগ্যের নিয়ন্তা। যত শক্তি, যত সহায়তা আমাদের চাই, সব তোমার নিজের মধ্যেই আছে। অতএব নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গঠন করো।

''সারাক্ষণ যদি মনে করি আমরা ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যাধি সারবে না। দুর্বলতার কথা মনে করিয়ে দিলে বিশেষ সহায়তা হয় না। সারাক্ষণ দুর্বলতার কথা ভাবলে শক্তি আসে না, দুর্বলতা নিয়ে চিন্তা করলে তাতে দুর্বলতার অবসান হয় না, শক্তি নিয়ে চিন্তা করলে দুর্বলতার অবসান হয়।

''এই জগতে এবং ধর্মের জগতে এই সত্য। ভয়ই অধঃপতনের এবং পাপের নিশ্চিত কারণ। ভয়ই দুঃখকে ডেকে আনে। ভয়ই মৃত্যুকে ডেকে আনে, ভয়ই অশুভের জন্ম দেয়।

''ভয় কোথা থেকে আসে? আমাদের স্বভাব সর্ম্পকে অজ্ঞতা থেকে। আমরা প্রত্যেকে রাজাধিরাজের অর্থাৎ ঈশ্বরের যুবরাজ। জেনে রাখো, সমস্ত পাপ, সমস্ত অশুভকে এক কথায় বলা যায় দুর্বলতা। সমস্ত মন্দ কাজের পিছনে শক্তি

জোগাচ্ছে দুর্বলতা। সমস্ত স্বার্থপরতার উৎস দুর্বলতা। দুর্বলতার কারণেই মানুষ মানুষকে আঘাত করে, দুর্বলতার কারণেই মানুষ যা নয় নিজেকে সেই ভাবে দেখায়।

''আমাদের জনসাধারণের এখন যা প্রয়োজন তা হল লোহার পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, প্রচণ্ড এক ইচ্ছাশক্তি, যাকে কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারে না, যা বিশ্বের রহস্য ভেদ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, যেকোনো ভাবেই হোক, তার জন্যে যদি সাগরের তলে যেতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়, তাহলেও।

''আমরা অনেক দিন ক্রন্দন করেছি, এখন নিজের পায়ে দাঁড়াও, মানুষ হও। আমাদের প্রয়োজন এমন ধর্ম যা মানুষ তৈরি করে। আমাদের প্রয়োজন এমন তত্ত্ব যা মানুষ তৈরি করে। আমাদের এমন সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা প্রয়োজন যা মানুষ তৈরি করে। এবং এইখানেই সত্যের পরীক্ষা। যা কিছু তোমাকে শারীরিক ভাবে, বুদ্ধিবৃত্তিকে আত্মিক শক্তিকে দুর্বল করে, তাকে খারিজ করো। যাতে প্রাণ নেই, তা সত্য হতে পারে না। সত্য শক্তি দেয়, সত্য পরিত্রাতা, সত্য সকল জ্ঞান। সত্য অবশ্যই শক্তিদাতা আলোকদাতা।

''আমরা তোতাপাখির মতো অনেক কথা বলি, কিন্তু কাজ করি না। কথা বলা, কাজ না করা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তার কারণ কী? শারীরিক দুর্বলতা। এরকম দুর্বল মস্তিষ্ক কোনও কাজ করতে পারে না। মস্তিষ্কের শক্তি আমাদের বাড়াতে হবে। সর্ব প্রথম আমাদের যুবকদের সবল হতে হবে। ধর্ম আসবে তার পরে, কৃষ্ণের বিশাল প্রতিভা ও বিশাল শক্তি তোমরা তখনই উপলব্ধি করতে পারবে যখন তোমাদের ধমনীতে শক্তিশালী রক্ত প্রবাহিত হবে। তোমরা উপনিষদ এবং আত্মার মহিমা আরও ভাল করে বুঝতে পারবে, যখন তোমাদের শরীর তোমাদের পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারবে এবং তোমরা অনুভব করবে যে তোমরা মানুষ।

''নীতি-পরায়ণ হও, সাহসী হও, সর্বান্তঃকরণে কঠোরভাবে নীতিপরায়ণ মানুষ হও, বেপরোয়া হও। কাপুরুষেরা পাপ করে, সাহসীরা কখনোই নয়। প্রত্যেকে, সকলকে ভালোবাসার চেষ্টা করো।

‘‘উঠে দাঁড়াও, জোয়ালে কাঁধ লাগাও। জীবন কত দিনের? একবার যখন পৃথিবীতে এসেছ, একটা চিহ্ন রেখে যাও। তা না হলে গাছ আর পাথরের সঙ্গে তোমার তফাৎ কী? তারাও জন্মায়, তারাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মারা যায়।

‘‘সাহসী হও। আমার সন্তানেরা সবার উপরে সাহসী হবে। কোনো কারণে একটুও আপস নয়। সর্বোচ্চ সত্য শেখাও। সম্মান হারানোর ভয় কোরো না, অপ্রিয় সংঘাত সৃষ্টি করাকে ভয় করো না। জেনে রাখো, সত্যকে ত্যাগ করার প্রলোভন সত্ত্বেও সত্যের সেবা করতে হবে।’’

সংস্কৃত নাম / শব্দের অর্থ

অবতারবাদ — হিন্দুরা বিশ্বাস করে পুনর্জন্মে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে একজন পূর্বজন্মের কিছু কিছু গুণাবলি নিয়ে আবার জন্মগ্রহণ করে। হিন্দুধর্মের তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। মহালক্ষ্মী ছিলেন বিষ্ণুর স্ত্রী, মহেশ্বরের স্ত্রী ছিলেন ভগবতী এবং পুত্রেরা ছিলেন কার্তিকেয় এবং গণেশ। বারে বারে মহৎ মানুষেরা হিন্দু সমাজে দেবতারূপে এসেছেন এবং তাঁদের অধিকাংশকে পূর্বে কোনো দেবতা অথবা তাঁর পত্নীর অবতার বলে গণ্য করা হয়। যেমন ভগবান রাম, ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান বেঙ্কটেশ্বর, ভগবান বালাজিকে বিষ্ণুর অবতার মনে করা হয়। ভগবান শিব, ভগবান নটরাজ, ভগবান সুব্রহ্মমণিয়মকে, মহেশ্বরের অবতার বলা হয়। দুর্গা ও কালীকে ভগবতীর অবতার মনে করা হয়।

ব্রহ্ম — ঈশ্বরের অনেক নামের একটি।

ব্রহ্মা — সনাতন ধর্মের প্রথম তিন প্রবক্তাদের একজনের নাম। তিনি মধ্য ভারতীয়।

বিষ্ণু — সনাতন ধর্মের প্রথম তিন প্রবক্তাদের একজন। তিনি দক্ষিণ ভারতীয় ছিলেন। তিনি নারায়ণ অথবা ভগবান বেঙ্কটেশ্বর নামেও খ্যাত।

বিষ্ণুঁ — ঈশ্বরের অনেক নামের একটি, বিষ্ণুঁ শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত মূল 'বিস' থেকে, যায় অর্থ ব্যাপ্ত হওয়া। বিষ্ণুঁ সর্বব্যাপী। দুই নামের সমতার জন্য কিছু ভ্রম হয়। বিষ্ণু মানুষ ছিলেন। বিষ্ণুঁ ঈশ্বরের অপর নাম।

দেবতা — দেবতারা ত্রাণকর্তা অথবা দেবদূত। দেবতারা মূলত ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ। দেবতারা ত্রাণকর্তা, পথপ্রদর্শক ইত্যাদির কাজ করেন। তাঁদেরকে লোকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। যেহেতু তাঁরা মানুষ ছিলেন, তাঁদের সকলের মানুষের মতো কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তাঁদের সকলের ওপরেই তখনকার সামাজিক সম্পর্ক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং তাঁদের সময়কার জীবনকালের প্রভাব সবসময় পড়েছিল। অতএব তাঁদের অনেক কাজকর্ম নিয়ে আমাদের আধুনিক মনে প্রশ্ন জাগতে পারে। তবে তাঁরা আমাদের প্রণম্য। সভ্যতার অগ্রগতিতে তাঁদের অবদান অনেক। তাদের সুকর্ম এবং সৎ পথ প্রদর্শনের ফল আমরা এখন প্রত্যেক দিন ভোগ করছি।

মহেশ্বর — সনাতন ধর্মের প্রথম প্রবক্তাদের অন্যতম। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন।

তাঁর আরও অনেক নাম আছে , যথা, শিব, রুদ্র, নটরাজ, ভগবান সুব্রহ্মণ্যম প্রভৃতি।

ব্রহ্মচর্য — আত্মসংযম, কামপ্রবৃত্তির সংযম করা হয় প্রধানত কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে মনের একাগ্রতার অবলম্বন করার জন্য ।

বেদ — সনাতন ধর্মের আদি শাস্ত্র , সৎ এবং সাফল্যময় জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করে। ঈশ্বর আদিদেবতাদের মাধ্যমে মানবজাতিকে বেদ দান করেছেন।

গীতা — যে কোনও ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে পালনের জন্যে ভগবান কৃষ্ণের উপদেশাবলি।

ধর্ম — নৈতিক মূল্যবোধ, প্রাত্যহিক জীবনে সাফল্য লাভ এবং আনন্দময় জীবন অনুসরণের পথকে বলা হয় ধর্ম। ধর্ম শিক্ষা দেয় যে মানব সমাজের সর্বময় মঙ্গল এবং নিজ মঙ্গল কীভাবে পালন করতে হবে এবং এই দুই সত্তা একে অপরের পরিপূরক ।

সনাতন ধর্ম — মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ধর্ম। পরবর্তী কালে তার নাম হয় হিন্দুধর্ম।

ভজন — ঈশ্বরের গুণগানের সুমধুর সঙ্গীত।

ভোজ উৎসব - পূর্ণিমার দিন সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যায় পূর্ণিমার আলোকে ধর্মীয় সামাজিক ভোজ, পালাক্রমে আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্খী ও বন্ধুরা মাসে একবার সন্ধ্যায় সকলে মিলে রাত্রের খাওয়ার আয়োজন করেন।

শূদ্র — কুশলী কারিগর, জীবিকা অর্জনের জন্যে যিনি দৈহিক শ্রম করেন।

ব্রাহ্মণ — যিনি শিক্ষকতার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরাই জ্ঞানের উৎস ছিলেন এবং বেদের প্রচার করতেন।

রাক্ষস — পৈশাচিক ব্যক্তি যে অন্য সকলের ক্ষতি করে জীবনধারণ করে।

অসুর — যে ব্যক্তি সমাজের মঙ্গলাকাঙ্খী নয়, স্বার্থপর এবং পৈশাচিক প্রকৃতির।

বৈশ্য — উদ্যোগী, যিনি ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

ক্ষত্রিয় — সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত যে ব্যক্তি জাতির অথবা কোনো সংগঠনের নিরাপত্তা বিধানের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন।

দলিত — যে ব্যক্তিকে কোনও বিশেষ বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ সমাজ করে দেয়নি এবং সে কারণে যিনি অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হন তিনিই দলিত হিসাবে সমাজে পরিচিত।
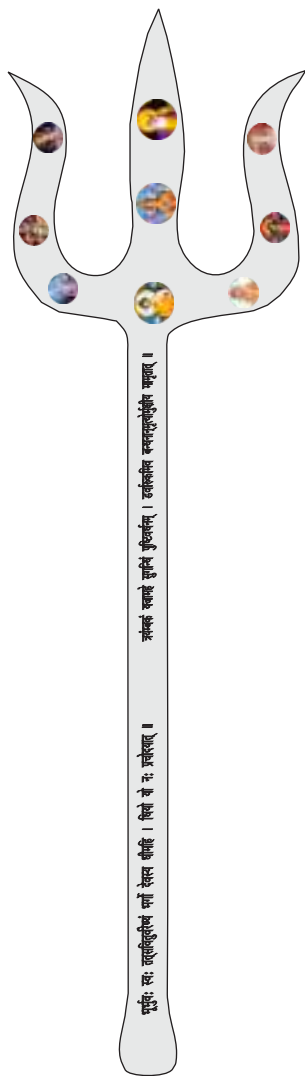
Mahamrityunjoy Trisul

Mahamrityunjoy Axe

Mahamrityunjoy Sword

This sword or axe or Trisul containing replica of Ishwar's angels becomes "Mahamrityunjoy", i.e., a guarantee against accidental disaster. Any one who keeps any one of these items at home and master the art of using these sword or axe or Trisul will be blessed by Ishwar to be healthy, wealthy, successful & very powerful.

বদ্রীনাথ ধাম প্রাচীনতম হিন্দু মন্দির, বেদের সময় হইতে ইহার অস্তিত্ব। ইহার উচ্চতা ৩১৩৩ মিটার।

"পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ" পুস্তকটিতে বেদ, গীতা, মনুসংহিতা, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি হিন্দুধর্মের মূলবিষয় সমূহ অতি ক্ষুদ্রাকারে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একজন হিন্দু পরিবারের সদস্যের পক্ষে হিন্দু ধর্ম সমন্ধীয় এই পরিমাণ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য এবং প্রায় পর্যাপ্ত।
পন্ডিত প্রদীপ রামনাথ, বদ্রীনাথ ধামের পুরোহিত

কেদারনাথ ধাম মহাভারতের সময় হইতেই পবিত্রতম হিন্দু মন্দির। ইহার উচ্চতা ৩৫৮৪ মিটার।

"পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ" পুস্তকটি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে। সমস্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।
পন্ডিত মহেন্দর শুক্লা, পুরোহিত, কেদারনাথ ধাম

ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন্
মিনিস্ট্রি অফ্ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, ইন্ডিয়া

"পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ" পুস্তকটির প্রতিটি অধ্যায় বিজ্ঞান মনস্কতা ও জীবনের শ্বাশত মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত। নূতন প্রজন্মের প্রত্যেককে মূর্তিপূজা, জাতিভেদ প্রথা এবং বিষ্ণুর দশ অবতার অধ্যায় সমূহ পড়িতে অনুরোধ করি। মানবিক হিন্দুধর্ম সমন্ধে যে জ্ঞানের দরকার তার প্রায় ৯০ শতাংশ এই পুস্তক পাঠের মাধ্যমে আহরণ সম্ভব।
ড সমীরণ দাস, অন্তরিক্ষ বিজ্ঞানী, ইসরো

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট্ অফ্ টেকনোলজি, খড়গপুর
মিনিস্ট্রি অফ্ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, ইন্ডিয়া

সারাজীবন বিজ্ঞান চর্চা করিয়াছি। সময় ও উৎসাহের অভাবে ধর্মগ্রন্থ পড়া হয় নাই। সম্প্রতি এই "পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ" পুস্তকটি আমার জীবনে একটি পরিবর্তন আনিয়াছে। ছাত্রাবস্থায় যদি এই পুস্তক পাঠের সুযোগ আসিত, জীবনে আরও অনেক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।
অধ্যাপক ড বি বি ঘোষ, আই আই টি, খড়গপুর

ISBN 81-903418-3-9
9788190341837